চন্দ্রকিরণ

সুনীল গাঙ্গুলী

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৩৭২

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
দিলীপকুমার চৌধুরী
সরস্বতী প্রেস
১২ পটুয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

বীণা ঘোষ

প্রিয়বরেষু

লেখকের অন্যান্য বই

তিনি ধুতির ওপর খদ্দরের লং কোট পরে ছিলেন। তাঁর এখন আটান্ন বছর বয়েস, গত চল্লিশ বছর ধরে তিনি এই একই পোশাক পরে আসছেন। মাঝে বার সাতেক বিদেশ ঘুরে এসেছেন, তখন শীত নিবারণের জন্য উলের পোশাক পরিধান করতে হয়েছিল।

তিনি প্রায় ছ' ফুটের কাছাকাছি লম্বা, শরীর এখনো ঋজু, মাথা ভর্তি চুল, সামান্যই পাক ধরেছে। প্রশস্ত কপাল, পুরু লেন্সের চশমা, ঠোঁটের ভঙ্গিতে একটু বক্রতা আছে, যাতে অহংকারীর ভাব আসে, কিন্তু তাঁর হাসিটি এখনো নির্মল। তাঁর নাম সত্যসুন্দর আচার্য। এটা তাঁর আসল নাম নয়, সন্ন্যাসীরা যেমন নাম বদলায় তিনিও তেমনি অনেকদিন আগেই নতুন নাম গ্রহণ করে পূর্বনাম বিস্মৃত হয়েছেন। তাঁর এক পিসীমা এখনো বেঁচে আছেন, একমাত্র তিনিই তাঁকে রাজু বলে ডাকেন।

তিনি গাড়ি থেকে নেমে লিফটের কাছে এসে দাঁড়ালেন। লিফট তখন ওপরে, আর অপেক্ষা না করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন, ততক্ষণে একজন আর্দালি পাগলের মতন লিফটের বেল টিপছে। তাঁর মতন এতখানি বয়স্ক কোনো সরকারী অফিসার লিফট থাকতেও সিঁড়ি দিয়ে ওঠেন না। কিন্তু সত্যসুন্দর সব দিকে থেকেই আলাদা রকমের মানুষ। তিনি সটান উঠে এলেন তিন তলায়।

তিন-চারজন বেয়ারা-আর্দালি ব্যস্তসমস্ত হয়ে তাঁর কামরার দরজা খুলে দিল সসম্ভ্রমে। কেউ অবশ্য নমস্কার অথবা সেলাম করলো না। তিনি প্রথম দিন এসেই সকলকে ডেকে বারণ করে দিয়েছেন।

শুধু চাকরির জন্যই নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা বেশী মাইনের অফিসারদের সেলাম জানাবে—এই বৃটিশ রীতি তিনি ঘোরতর অপছন্দ করেন।

তিনি তাঁর চেয়ারে বসে টেবিলে ঢেকে-রাখা জলের গেলাসে চুমুক দিলেন। পকেট থেকে একটা ছোট চামড়ার বাক্স বার করলেন। তাতে চার পাঁচটা চুরুট, একটা বেছে নিয়ে ধরালেন যত্ন করে, প্রথম বার ধোঁয়া ছেড়ে তিনি আপন মনেই বললেন, বাঃ।

সত্যসুন্দর আচার্য কেন বাঃ বললেন? এক একটা চুরুট থাকে, যেটা থেকে কিছুতেই সহজে ধোঁয়া বেরুতে চায় না। যত দামী চুরুটই হোক, তার মধ্যে একটা এ রকম থেকেই যায়। হয়তো চুরুটের সামান্য একটু ঠাণ্ডা লেগেছে, অথবা কোথাও রয়েছে একটা সূক্ষ্ম ছিদ্র। যাদের চুরুট খাওয়ার অভ্যেস আছে, তারাই শুধু বুঝতে পারবে, এই ধরনের চুরুট ধরাবার পর কি রকম মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। অপর পক্ষে, চুরুটের প্রথম টানেই সাবলীল ধোঁয়া এলে মেজাজ পরিতৃপ্ত হয়। তিনি কি সেই কারণেই বাঃ বললেন!

কিংবা এমনও হতে পারে, তিনি তাঁর সম্পূর্ণ জীবন সম্পর্কেই পরিতৃপ্ত। কোথাও কোনো গ্লানি নেই। জীবনে কোথাও পরাজিত হন নি, তাই নিজেকে শোনালেন ঐ কথাটা। অথবা এমনও হতে পারে, ইদানীং মধ্যাহ্ন ভোজনের পর একটু একটু বায়ুর চাপ দেখা দেয়, আজ জল খেয়েও সেই বায়ুর অস্তিত্ব বোধ করলেন না বলে উচ্চারণ করলেন ঐ আনন্দের উক্তি।

মোট কথা, এই বয়সেও, সত্যসুন্দর প্রায়ই নিজের সঙ্গে কথা বলেন।

চুরুট হাতে নিয়ে তিনি উঠে এলেন জানলার কাছে। তাঁর অফিসের এই ঘরটির অবস্থান খুব ভালো। জানলা দিয়ে দেখা যায় কলকাতার সবচেয়ে সুন্দর জায়গার এক টুকরো দৃশ্য। ইডেন গার্ডেনস, কেল্লার ধারের প্রান্তর, গঙ্গা, কয়েকটি বিদেশী জাহাজ ও অনেকখানি আকাশ।

দিনটি সুন্দর, শীতকালের ঝকঝকে রৌদ্রের দুপুর, অল্প অল্প নরম হাওয়া।

জানলায় কোনো শিক নেই, তিনি বাইরের দিকে একটু ঝুঁকে দেখতে লাগলেন সেই দৃশ্য। পুনরায় বললেন, ওরা বেশ আছে।

কারা ?

গঙ্গার পার্শ্ববর্তী স্ট্র্যাণ্ডে এই দুপুরবেলাতেও কয়েকজন তরুণ-তরুণীকে হাঁটতে দেখা যায়। কয়েকজন বেঞ্চের অনেকখানি জায়গা রেখে বসেছে খুব পাশাপাশি। সত্যসুন্দরের অফিস ঘর থেকে এই দৃশ্য বেশ দূর, তবু মোটামুটি বোঝা যায়। তিনি ঠিক তরুণ-তরুণীদের দিকে তাকিয়ে নেই।

আউটরাম ঘাটের ঠিক পাশেই বেদে বেদেনীদের কয়েকটা তাঁবু পড়েছে। বছরের এই সময়টা প্রতিবারই ওরা আসে, নানা জাতের কুকুর বিক্রি করে ওরা। গণ্ডারের খড়্গ এবং বাঘের অণ্ডকোষ নিয়েও নাকি গোপন কারবার করে, এমন শোনা যায়। এখন দুপুরবেলা ঘাগরা পরা বেদেনীরা ফুটপাথের ওপরেই উনুন জ্বালিয়ে রান্না চাপিয়েছে—খিচুড়িতে এত বেশী হলুদ ঢেলেছে যে গাঢ় হলুদ রং দূর থেকেও বোঝা যায়। নদীর বুকে অনেক ছোট ছোট নৌকো। একটা নৌকোর দু'দিক থেকে দুটি কিশোর ছেলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে সাঁতার কেটে আবার ফিরে আসছে। এই রকম খেলায় ওরা অনেকক্ষণ মেতে আছে।

এই সব দৃশ্য কিছুক্ষণ চোখে রেখে তিনি আবার ফিরে এলেন চেয়ারে। এখন কাজে বসবেন।

ভারত সরকার সদ্য যে তৃতীয় ভাষা কমিশন বসিয়েছেন, তাতে সত্যসুন্দর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন। এক বছর—দেড় বছরের কাজ। সারা জীবনে তিনি কক্ষনো বাঁধা চাকরি করেন নি, তবে এই ধরনের কাজ নিতে হয়েছে মাঝে মাঝে।

তিনি কয়েকটি ফাইল খুলে রিপোর্ট পড়তে লাগলেন। চশমাটা বদলে কাছে-দেখার চশমাটা পরে নিয়েছেন। এখন তাঁর ঠোঁটটি

আরও বাঁকা দেখায়, সেই জন্য বেশী অহংকারী মনে হয়। অপরের লেখা যে-কোনো জিনিস পড়তে গেলেই তাঁর ভেতরে এই রকম একটা অবহেলার ভাব আসে।

কয়েক মাস পরেই পূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরতে হবে তাঁকে, সাক্ষ্য নিতে হবে অনেক লোকের। তিনি সেই জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। অফিসে এবং বাড়িতেও। তাঁর স্ত্রী লীলা মফঃস্বলে বেড়াতে ভালোবাসে না। সত্যসুন্দরের সঙ্গে তাকে ভারতের বহু জায়গায় এবং বাইরের নানা দেশে ঘুরতে হয়েছে, তবু তার মধ্যে ভ্রমণের নেশা ধরে নি। বিশেষত মফঃস্বলে সন্ধ্যের পর যে নির্জন জীবন, তা তার সহ্য হয় না। যদিও, সত্যসুন্দর যেখানেই যাবেন, প্রত্যেক জায়গাতেই সার্কিট হাউসে তাঁর জন্য আগে থেকে রিজার্ভেশন থাকবে, থাওয়া থাকার কোনো অসুবিধে নেই, এবং ইচ্ছে হলেই তিনি সরকারী গাড়িতে যে-কোনো বিখ্যাত দৃশ্য, সংরক্ষিত অরণ্য বা দুর্গম জলপ্রপাত দেখে আসতে পারেন। লীলার ওসবও ভালো লাগে না। লীলা সবচেয়ে অপছন্দ করে অচেনা মানুষ। সত্যসুন্দর যে-কোনো জায়গায় গেলেও বহু লোক আসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের একঘেয়েমিতে লীলা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। লীলার বয়েস সত্যসুন্দরের অর্ধেক—এই ব্যাপারে বাইরের লোকের কৌতুহলের শেষ নেই।

সত্যসুন্দরের কাছাকাছি যে-সব মানুষ আসে, তারা সকলেই সত্যসুন্দরকে বাঘের মতন ভয় করে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে সত্যসুন্দর সকলের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন কিংবা ধমকে কথা বলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বই অন্যদের ছোট করে রাখে। সত্যসুন্দরকে দেখলেই মনে হয়, তাঁর যেন আরও বড় কিছু হবার কথা ছিল।

কিন্তু সত্যসুন্দরের পাশে তাঁর স্ত্রী লীলাকে যেন কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারা যায় না। এই প্রৌঢ় প্রতিভাবান বিশাল পুরুষটির পাশে

একজন কোমল স্বভাবের মধ্যবয়েসী মহিলাকেই যেন সকলে আশা করে। তার বদলে লীলা; সত্যসুন্দরের মেয়ের বয়েসী, ফর্সা, ছিপছিপে চেহারার তরুণী, সাজপোশাক খানিকটা উগ্র। বাইরের লোকজনের সামনেও সত্যসুন্দর লীলার সঙ্গে এমন সুরে কথা বলেন যেন তিনি একটি জীবন্ত পুতুল নিয়ে খেলা করছেন। ঠোঁটের হাসিটা কখনো মোছে না।

অবশ্য সত্যসুন্দরকে কোনোক্রমেই স্ত্রীর বশীভূত বলা যায় না। তাঁর মতন বয়স্ক পুরুষের তরুণী ভার্যা থাকলে যতখানি দুর্বলতা থাকার কথা, সত্যসুন্দরের ব্যবহারে তার কোনো প্রকাশ নেই। তিনি স্ত্রীকে খুশী রাখতে চান, কিন্তু সে জন্য তাঁর পড়াশুনো বা কাজের অবহেলা করেন নি কখনো।

লীলা মাঝে মাঝে সত্যসুন্দরের দু'একটি ইচ্ছের প্রতিবাদ করে। যেন সে সত্যসুন্দরের ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করতে চায়। সত্যসুন্দর তখনো লীলাকে ধমক দিয়ে নিরস্ত করতে চান না। তিনি শুধু সময় নেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছেরই জয় হয়। তিনি নিজে যেটা চান, সেটা পেতেই অভ্যস্ত।

সত্যসুন্দর হুকুম দিয়ে রেখেছেন, লীলাকে যেতেই হবে তাঁর সঙ্গে। লীলা প্রবল আপত্তি জানিয়েছে। কিন্তু আরও দু' মাস সময় আছে—এতদিন ধরে লীলা সত্যসুন্দরের অনড় আদেশের সঙ্গে যুঝতে পারবে না।

সত্যসুন্দর বেল বাজালেন। আর্দালি এসে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, প্রবীর চক্রবর্তীকে ডাকো।

তিনি কখনো তাঁর সহকর্মীদের প্রবীরবাবু বা বিমলবাবু বলেন না, আর্দালিদের কাছে বলেন না চক্রবর্তী সাহেব বা সেন সাহেব। তাঁর অনেক রকম বাতিক আছে। এরকম গল্প আছে যে, তিনি একবার কেন্দ্রের এক মন্ত্রীকে হঠাৎ ধমক দিয়ে বলেছিলেন,

যে বিষয়ে মানুষ কম জানে, সে বিষয়ে বেশী কথা বলা তার উচিত নয়।

সত্যসুন্দর ইংরেজি এবং জার্মান ভাষায় গবেষণা গ্রন্থ লিখেছেন। যৌবনে তিনি আফগানিস্তান সীমান্ত ধরে পায়ে হেঁটে রুশ দেশে গিয়েছিলেন। এক সময় সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে তাঁর কিছু যোগাযোগ ছিল। পরবর্তীকালে রাজনীতির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি জ্ঞানচর্চায় মন দেন। ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে সামাজিক ইতিহাস নির্মাণের ব্যাপারে তিনি পৃথিবীর প্রধান পণ্ডিতদের মধ্যে একজন। তিনি দুঃসাহসী পুরুষ। তিব্বত ও বেলুচিস্তানে তিনি কয়েকবার বেশ বিপদে পড়েছিলেন, একাধিকবার প্রাণ সংশয় হয়েছিল, রীতিমতন রোমাঞ্চকর জীবন। এক শতাব্দী আগে জন্মালে তিনি অবশ্যই একজন দেশবরেণ্য হতে পারতেন। এ যুগেও যদি তিনি ধর্মপ্রচার কিংবা রাজনীতিতে নামতেন, তা হলে সাড়া ফেলে দিতে পারতেন অনায়াসে। কিন্তু তিনি ঘোর নাস্তিক এবং মানবতা-টানবতা ইত্যাদি বড় বড় কথাকে উপহাস করেন।

সত্যসুন্দরের মতন মানুষরা সাধারণ জীবন যাপনের জন্য জন্মায় না। এঁর শরীরটা যেমন বৃহৎ, তেমনি বুদ্ধি ও মেধাও সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক বেশী। ইনি যদি দস্যু সর্দার কিংবা সেনাপতি হতেন, তাহলে বহু মানুষকে পদানত করে রাখতে পারতেন। তার বদলে জ্ঞানচর্চায় মন দিলেও অহংকারটা রয়ে গেছে পুরোপুরি। কারুকেই নিজের সমকক্ষ ভাবতে পারেন না।

আর্দালি এসে জানালো, প্রবীর চক্রবর্তী তখনও লাঞ্চ থেকে ফেরেন নি।

সত্যসুন্দর বললেন, আচ্ছা।

তিনি টেবিলে পাতা ব্লটারের ওপর ছেলেমানুষের মতন লাল পেন্সিল দিয়ে হিজিবিজি কাটতে লাগলেন, তারপর বাংলা ও

ইংরেজিতে দু' বার লিখলেন 'লাঞ্চ'। তিনি ভাবছেন লাঞ্চ কথাটার কোনো জুতসই প্রতিশব্দ পাওয়া গেল না। আর খুঁজে লাভ নেই বোধ হয়। মধ্যাহ্ন ভোজন চলবে না, অন্য কোনো খটমট শব্দের তিনি বিরোধী। তবে, টিফিন কথাটার একটা চমৎকার প্রতিশব্দ ছিল জলখাবার, কিন্তু সেটাও তো চললো না তেমন। বাড়িতে অনেকে এখনও জলখাবার খায় বটে, কিন্তু অফিস থেকে বেরিয়ে কেরানীরা সবাই টিফিন খেয়ে আসে। আর্দালিরাও টিফিন করতে যায়।

সাড়ে তিনটে বাজে, প্রবীর এখনো লাঞ্চ থেকে ফেরে নি, তার মানে সে আর অফিসে নাও আসতে পারে। সত্যসুন্দর তার সমস্ত সহকর্মীদের বলে দিয়েছেন, যে যখন খুশী অফিসে আসতে পারে, যখন খুশী চলে যেতে পারে। তাঁর কাছে কারুর ছুটি চাইবার দরকার নেই। তিনি জোর করে কাজ করানোতে বিশ্বাস করেন না। প্রত্যেক তিন মাস অন্তর যার যেটুকু কাজের দায়িত্ব আছে তিনি পরীক্ষা করে দেখেন। আশানুরূপ অগ্রগতি না দেখলে তিনি এক কথায় ছাঁটাই করে দেন। এটা পুরোপুরি সরকারী অফিস নয়, সব কর্মীই নিযুক্ত হয়েছে অস্থায়ী ভিত্তিতে। সত্যসুন্দর আগে থেকেই শর্ত করে নিয়েছেন, তাঁর নির্দেশের ওপর আর কোনো আমলাতন্ত্রী খবর্দারি চলবে না।

প্রবীরকে তিনিই চাকরি দিয়েছেন। ছেলেটি লিঙ্গুইসটিকসে সদ্য ডি ফিল করে বেকার বসেছিল। মাঝে মাঝে আসতো তাঁর বাড়িতে পড়াশুনোর বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য। এ রকম অনেকেই আসে। তবে, প্রবীর আবার লীলার বাপের বাড়ির দিকে কি রকম যেন আত্মীয় হয়, তাই একটু বেশী সুযোগ পেয়েছিল।

সত্যসুন্দর প্রবীরকে বলেছিলেন, পায়ে হেঁটে সারা ভারতবর্ষ একবার ঘুরে আসতে। বই পড়া বিদ্যে যা হবার তা তো হয়েছে। এখন মানুষের সঙ্গে না মিশলে, মানুষের বিভিন্ন রকম ভাষার হের

ক্ষের লক্ষ্য না করলে এই বিদ্যা শিক্ষার সার্থকতা কি? সত্যসুন্দর নিজেও এইরকমভাবে শিখেছেন—এগারোটি ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলতে ও লিখতে পারেন। এই প্রত্যেকটি ভাষাই, মাতৃভাষার মতন, তিনি আগে কথা বলতে শিখে তারপর ব্যাকরণ জেনেছেন।

প্রবীর এই প্রস্তাবে রাজী হতে পারে নি। তার পারিবারিক ভরণপোষণের প্রশ্ন আছে। তাকে চাকরি করতেই হবে।

সত্যসুন্দর বিরক্ত হয়েছিলেন। তবু, লীলার অনুরোধে তিনি প্রবীরকে দিয়েছেন এই চাকরি।

প্রবীর অবশ্য চাকরি বেশ মন দিয়েই করছে। সরকারী চাকরিতে লেগে থাকলে এক সময় ব্রাইট অফিসার হিসেবেই গণ্য হবে। বেশ চালাক-চতুর, ছটফটে ছেলে, কোনো একটা বিষয় চট্ করে বুঝে নেবার ক্ষমতা আছে। তবু সত্যসুন্দর খুশী হতে পারেন না। তিনি সব সময় তীক্ষ্ণ চোখে প্রবীরের হাবভাব লক্ষ্য করেন। তাঁর মনে হয়, প্রবীরের উচ্চাভিলাষ নেই। সে শুধু যেন চাকরিতেই উন্নতি করতে চায়, মানুষ হিসেবে বড় হয়ে ওঠার কথা চিন্তাও করতে পারে না।

সত্যসুন্দর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রবীরের সাংসারিক খবরাখবর নিয়েছিলেন। তার বাবা চাকরি থেকে রিটায়ার করার পরেই মারা যান। চাকরি জীবনে খুব বেশী টাকা জমাতে পারেন নি। তাই ওদের সংসারে একটু টান পড়েছে। তবে, প্রবীরের ছোট ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, সে আর কয়েক মাসের মধ্যেই পাস করে বেরুবে, তারপর সে একটা ভালো চাকরি পাবেই। প্রবীরের এক বোন বি. এ. পাস করে বসে আছে। অর্থাৎ অরক্ষণীয়া পাত্রী, তার বিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও প্রবীরের। সেটা মিটে গেলেই প্রবীর অনেকটা দায় মুক্ত হবে। অর্থাৎ, ছোট ভাইয়ের পড়াশুনো ও বোনের বিয়ে দেওয়ার জন্যই একজন যুবক নিজের উচ্চাভিলাষ ত্যাগ করে

চাকরিতে আবদ্ধ হবে! অদ্ভুত সামাজিক ব্যবস্থা। সত্যসুন্দরের হাসি পায়।

সত্যসুন্দরের জন্যই যে প্রবীর এই ভালো চাকরিটা পেয়ে গেছে, এজন্য সে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, প্রায়ই মুখেও সে কথাটা জানায়। সত্যসুন্দর বিরক্ত হন। মানুষের কৃতজ্ঞতায় তিনি বিশ্বাস করেন না।

অভাব অভিযোগ এবং দারিদ্র্যের কথা শুনলেও তিনি ঘৃণা বোধ করেন। তিনি জানেন, পৃথিবীতে অনেক গরীব লোক আছে, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে তিনি কোনো সম্পর্ক রাখতে চান না। ইতিহাস নিরীক্ষা করে তিনি দেখেছেন, মানুষের মধ্যে বিরাট এক শ্রেণীর গরীব থাকবেই। কোনো দেশে খেতে না-পাওয়ার স্তরের পর্যন্ত গরীব। আর কোনো কোনো দেশে খেতে-পাওয়া গরীব। এ ছাড়া আছে এক সর্বব্যাপী মানসিক দারিদ্র্য। যে মানুষ যে-কোনো উপায়েই হোক এর থেকে নিজের চেষ্টায় বেরিয়ে আসতে না পারে, মানুষ হিসেবে সে, সত্যসুন্দরের চোখে নগণ্য।

সত্যসুন্দর এই রকম ভাবেন, তার কারণ তিনি বাল্যকালে ছিলেন বস্তির ছেলে। অন্তত কয়েকটা বছর বস্তিতে কাটিয়েছেন। চুরির দায়ে যে-সময় সত্যসুন্দরের বাবা জেল খাটছিলেন। মিথ্যে অভিযোগে নয়, সত্যিই চুরি করেছিলেন তাঁর বাবা, অফিসের টাকা ভেঙে রেস খেলতেন। সত্যসুন্দরের তখন তের বছর বয়েস, বিপদে পড়ে তাঁর মা তাঁর কাকাদের কাছে গিয়েছিলেন সাহায্য চাইতে! কাকারা কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন অপমান করেছিলেন যে সেই তের বছরের ছেলেই রাগে জ্বলে উঠেছিল। বাইরে বেরিয়ে এসে তিনি কাকাদের বাড়ির দেওয়ালে থুতু ফেলে হীথক্লিফের মতন বলেছিলেন, একদিন এই বাড়ি আমি ভেঙে ফেলব।

সমাজ জীবনে অনেক ভদ্রব্যক্তিই নানভাবে চুরি করে। কিন্তু

যেই একজন ধরা পড়ে যায়, অমনি সকলে মিলে ঘৃণা করতে শুরু করে তাকে। ধরা-পড়া চোরের প্রতি অন্য চোরদের ঘৃণাই বেশী হয়। চোরের বউ ও ছেলের কথা কেউ ভাবে না। কিন্তু এই ঘটনায় উপকার হয়েছিল কিশোর সত্যসুন্দরের। তিনি প্রায় তপস্যা করার মতই কঠোরতায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন পড়াশুনোয়।

তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা বিশাল, তার মধ্যে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সেকেণ্ড হয়েছিলেন। বস্তিবাসী ছেলের এরকম চমকপ্রদ রেজাল্ট করার ঘটনায় খবরের কাগজের লোকেরা এসেছিল তাঁর ছবি নিতে। কিন্তু এমনই গোঁয়ার ছিলেন সত্যসুন্দর যে রেজাল্ট বেরুবার পর তিনি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন পর্যন্ত। ফার্স্ট হতে পারেন নি বলে তাঁর আত্মাভিমানে দারুণ আঘাত লেগেছিল।

এর পর তিনি নিজের জীবনযাপনের উন্মাদনায় মা ভাইবোন সকলকে পরিত্যাগ করে চলে গেছেন। সকলেই মনে করে তাঁর শরীরে দয়া মায়া কম।

সত্যসুন্দর আবার আপন মনে বললেন, এরা আমাকে চেনে না।

সেই কৈশোর বয়সেই সত্যসুন্দর বুঝেছিলেন যে পরিবারের সকলের জন্য চিন্তা করতে হলে তাঁকে একজন কেরানী বা কলেজের সাধারণ অধ্যাপক হয়েই জীবন কাটাতে হবে। কিন্তু এই সমাজের ওপর তাঁর রাগ এমনই অসম্ভব ছিল যে তিনি ঠিকই করেছিলেন যে সারা জীবন তিনি এই সমাজকে অবজ্ঞা করে চলবেন। সেই জন্যই আই এ পড়তে পড়তে হঠাৎ এক মধ্যরাত্রে তিনি বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। তখন তাঁর পকেটে সম্বল ছিল মাত্র সাতটি টাকা।

গৃহত্যাগের সম্পর্কে তিনি মনে মনে এই যুক্তি দিয়েছিলেন যে, হঠাৎ যদি তাঁর মৃত্যু হতো, তা হলে কে দায়িত্ব নিত তাঁর সংসারের ?

হঠাৎ সে রকম কোনো দুর্ঘটনা তো হতেই পারে। তা ছাড়া, তিনি যে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন, যদি সার্থক হতেন, তা হলে তাঁর মা-ভাই বোন কি সকলে না খেয়ে মরতো? একজনের কাঁধের ওপরে কি অন্য অনেকগুলো মানুষের জীবন সত্যিই এতটা নির্ভর করে? তিনি ধরে নিলেন, সেদিন থেকে তাঁর সংসারের কাছে তিনি মৃত। সেই সময়েই তাঁর নামটা তিনি পালটে নেন।

তিনি আবার বেল বাজালেন। আর্দালি আসতেই বললেন, বিমল সেনকে ডাকো।

বিমল সেন মোটাসোটা চেহারার মাঝবয়সী লোক। অনেক-কাল অধ্যাপনা করেছেন। খুব বেশী উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, জীবনে যা পেয়েছেন তাতেই পরিতৃপ্ত! টালিগঞ্জে দু' কাঠা জমির ওপর একটা ছোট বাড়ি বানাচ্ছেন, অফিসের কাজের চেয়ে সেই বাড়ির চিন্তাতেই তিনি অধিকাংশ সময় মগ্ন থাকেন। তাঁর চারটি ছেলে-মেয়ে লেখা পড়ায় তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। একটি তো চাকরির বাজারে এলো বলে!

বিমল সেন চেয়ারে বসবার পর সত্যসুন্দর তাঁকে বললেন, কারুর সঙ্গে আমার কথা বলার ইচ্ছে হয়েছে বলেই আপনাকে ডেকেছি। অফিসের কোনো কাজে নয়। আপনার হাতে কি জরুরী কোনো কাজ ছিল?

বিমল সেন বললেন, না, সে রকম কিছু না। ট্রাইব্যুনালদের রিপোর্টটা তৈরি করছিলাম, কাল করলেও চলবে!

সত্যসুন্দর হেসে বললেন, কাল কেন, পরশু হলেই বা দোষ কি! সবাই জানে, এসব সরকারী কমিশনের আঠারো মাসে বছর। কোনো কমিশনই তো আড়াই বছর তিন বছরের আগে রিপোর্ট দেয় না।

—আমরা দেড় বছরের মধ্যেই সব শেষ করে ফেলতে পারবো।

—সেইরকমই তো কথা দিয়েছি। ইচ্ছে করলে সময় বাড়ানো যায়। সেটাই তো উচিত, কি বলেন ?

—না, তেমন কোনো দরকার তো দেখছি না।

—আপনার অসুবিধে নেই। কিন্তু ছেলে ছোকরারা তো আবার বেকার হয়ে পড়বে। প্রবীর, যশপাল, সুধা—এরা তো ডেপুটেশানে আসে নি আপনার মতন।

—হ্যাঁ, প্রবীর বলছিল ওর একটা পাকা চাকরি বিশেষ দরকার। বাড়িতে অনেক লোকজন।

—তাও তো বিয়ে করে নি।

—ওর বাবা মারা গেছেন গত বছরে, বয়স বেশী হয় নি, আপনার চেয়েও কম বয়েস ছিল।

—ঠিক আছে, আবার তো একটা কমিশন বসবে। তখন আমি তাতে না থাকলেও প্রবীরের নাম সুপারিশ করে দেবো। যদিও আমার মনের ইচ্ছে, ছেলেটার ঘাড় ধরে মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিতে ছেড়ে দিয়ে আসি! সেমেটিকদের ভাষা নিয়ে ওর কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞানই হলো না!

বিমল সেন একটু চুপ করে গেলেন। সত্যসুন্দর আচার্যের এইসব পাগলামির কোনো জবাব দেওয়া যায় না। যার মাথার ওপরে একটা সংসারের দায়িত্ব, সে ল্যাঙ্গোয়েজ স্ট্যাডি করার জন্য মিডল ইস্টে যাবে, এটা কি একটা সুস্থ লোকের মতন কথা ?

সত্যসুন্দর বললেন, ছোকরার চেহারাটা তো সুন্দর। সিনেমায় নামার চেষ্টা করলেই পারে। মুখ চোখ ভালো কিন্তু চেহারায় কোনো ব্যক্তিত্ব নেই—এই রকম নায়কই তো সিনেমায়······

—স্যার, আপনি সিনেমা দেখেন ?

—প্রায়ই তো দেখি। বাংলা, হিন্দী। তা ছাড়া, জানেন, আমি নিজেও একবার ফিলমে কাজ করেছিলাম।

—সত্যি ?

—হ্যাঁ। তখন আমার বয়েস ছাব্বিশ সাতাশ বছর। দিনের বেলা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পড়াশুনো করি, আর সন্ধ্যের পর সোজা সোহো পল্লীর একটা হোটেলে বাসন মেজে দিয়ে দুটো খেতে পাই। আমার খিদেটা বরাবরই বেশী। পেটের জ্বালা নিয়ে কি আর পড়াশুনো করা যায় ? থাকি একটা বাড়ির অ্যাটিকে—সে বাড়িটাতে আবার গিসগিস করে বেশ্যারা, অনেক রাত পর্যন্ত হৈ-হল্লা—

বিমল সেন মুখ নীচু করলেন। প্রখ্যাত পণ্ডিত এবং অফিসের সর্বোচ্চ পদাধিকারীর মুখ থেকে বেশ্যা শব্দটা অনায়াসে বেরিয়ে এলেও তাঁর কানে লাগে। যে-কোনো মধ্যবিত্ত বাঙালীর মতনই তাঁর নৈতিকতা অতি প্রখর।

সত্যসুন্দর বললেন, এই সময় কিছু উটকো রোজগার হয়ে গেল। জে আর্থার র‍্যাঙ্ক-এর কম্পানি একটা ঐতিহাসিক ফিলম তুলছিল—ঐতিহাসিক মানে গাঁজাখুরি আর কি—যাই হোক, তাতে ভিড়ের দৃশ্যে শত শত লোক দরকার ছিল—পাড়া থেকে আমাদের অনেকেরই সুযোগ মিলে গেল, দিনে পাঁচ পাউণ্ড। ধড়াচুরো পড়ে দৌড়োদৌড়ি করতে হতো। তলোয়ারের ঘা খেয়ে মরে যাওয়ার অভিনয় ছিল আমার। কতবার যে মরলাম। একবার করে মৃত্যু যন্ত্রণায় চিৎকার করে শুয়ে পড়ি—আর ওরা বলে যে, ছবি তোলা ঠিক হয় নি, আবার মরতে হবে। আমি গ্রীক ভাষা জানি, একবার গ্রীক ভাষায় একটা কাতরোক্তি করেছি বলে পরিচালকের কি রাগ। হা-হা-হা-হা—

—ছবিটার নাম কি স্যার ?

—সে সব মনে নেই। তবে, সবসুদ্ধ পঞ্চান্ন পাউণ্ড রোজগার হয়েছিল, ভালো খাবার-দাবারও দিত—সেই টাকাটা সম্বল করেই কায়রো চলে এসেছিলাম, হিয়েরোগ্লিফিকস সম্পর্কে প্রত্যক্ষ

অভিজ্ঞতা নিতে। সেই সময় ডঃ কুনও কায়রোতে, পরিচয় হয়ে গেল—

হঠাৎ থেমে গেলেন সত্যসুন্দর। তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, দুঃখিত। আমাকে মাপ করবেন।

বিমল সেন সচকিতভাবে মুখ তুলে তাকালেন। দু' চোখে প্রশ্ন।

সত্যসুন্দর বললেন, আমি খুব দুঃখিত। নিজের জীবন কাহিনী জোর করে অপরকে শোনানো একটা খারাপ ব্যাধি। বার্ধক্যে এই রকম ব্যাধি বেশী দেখা দেয়। আমার আগে এরকম ছিল না—

বিমল সেন প্রতিবাদ করে বললেন, না, স্যার, দারুণ ইণ্টারেস্টিং লাগছিল। আপনার জীবনে এত সব অভিজ্ঞতা আছে। আপনি এবার একটা আত্মজীবনী লিখুন না।

—আমার জীবনী অন্য লোকে জেনে কি করবে ?

—এতকাল ধরে আপনি যা সঞ্চয় করেছেন, তার ভাগ যাতে অন্যরা পেতে পারেন। বৃটিশ পণ্ডিতরা অনেকেই আত্মজীবনী লেখেন
—আমাদের দেশে এ রকম ট্রাডিশন নেই—

—আমার আগ্রহ হয় না।

—আপনি তো বহু দেশ ঘুরেছেন, ছোট ছোট ভ্রমণ কাহিনীর আকারেও যদি লেখেন—টয়েনবী সাহেব যেমন লিখেছেন 'ফ্রম অক্সাস টু যমুনা—'

সত্যসুন্দর আর ও বিষয়ে কোনো কথা বললেন না। প্রসঙ্গ ফিরিয়ে বললেন, এই ঘটনাটার এই জন্য উল্লেখ করলাম যে, পড়াশুনো করতে গেলে যে-কোনো উপায়ে টাকা রোজগার করা দরকার। অর্থ চিন্তা থাকলে জ্ঞানচর্চা করা যায় না। আর টাকা রোজগারের জন্য চুরি-ডাকাতি ছাড়া যে-কোনো উপায়ই গ্রহণ করা উচিত। আমি তো কিছুদিন ব্যবসাও করেছিলুম।

বিমল সেন জানেন, সত্যসুন্দর রীতিমতন ধনাঢ্য লোক। শুধু বই লিখে এত টাকা হতে পারে না। মানুষটির মধ্যে অসাধারণত্ব আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ঠিক যেন শ্রদ্ধা করা যায় না। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এমন ভোগবাদী দর্শন মানায় না যেন ঠিক।

সত্যসুন্দরের একটি মন্তব্যে বিমল সেনের মনের মধ্যে অনেকক্ষণ কুরকুর করছিল। এবার সুযোগ পেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, স্যার, আপনি যে বললেন, আর একটা ভাষা কমিশন বসবে, সে রকম কিছু খবর পেয়েছেন ?

সত্যসুন্দর এবার হাসলেন। তারপর বললেন, বসবে না ? আপনার কি মনে হয় ?

—মানে এটা এখনো শেষ হলো না। এর মধ্যেই আর একটা।

—এই তো এ দেশের নিয়ম। আমাদের এই কমিশনের রিপোর্ট তৈরি হলে, আপনার কি ধারণা সেটা জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করা হবে ? কিংবা সরকার সেটা মানবে ? আমাদের রিপোর্ট অনুযায়ী কাজ করতে গেলে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আবার ভাষা দাঙ্গা লেগে যাবে। সেটাকে ধামা চাপা দেবার জন্য আবার একটা কমিশন। তাতে আবার অন্তত দু' তিন বছর কাটবে। এই রকমই তো চলে আসছে।

বিমল সেন একটু বিষণ্ণভাবে বললেন, কোনো ফল হবে না জেনেও আমরা তা হলে এ কাজ করছি কেন ?

—আপনি মন খারাপ করছেন নাকি ? উঁহুঃ, এটা ঠিক নয়। গীতায় তো একটা মোক্ষম বাণী ঝেড়ে দিয়ে গেছে, কর্মেই আপনার অধিকার, ফলাফল নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

—এটা খুব সঙ্কীর্ণ অর্থ করা হলো না ?

—আপনার মন-মতন বৃহৎ অর্থ করে নিন্। মোট কথা, আত্মগ্লানি ভালো নয়। আগে থেকে বিবেক পরিষ্কার রাখাই সুবিধা-

জনক। আমি এই বুঝি যে জ্ঞানচর্চা শুধু নিজের বিশুদ্ধ আনন্দের জন্য। এর সঙ্গে জীবিকা বা অন্ন সংস্থানের ব্যাপার জড়িয়ে ফেললে কিছু কিছু নীচতার আশ্রয় নিতে হবেই। দেখেন না, কত লোক সরস্বতীকে নিয়ে বানরীর মতন নাচিয়ে বেড়ায়।

এই রকম একটা কথা বিদ্যাসাগর মশাইও বলেছিলেন বটে, তবু বিমল সেনের ঈষৎ সংস্কারগ্রস্ত মনে এই প্রকার উৎপ্রেক্ষা একটা ধাক্কা দেয়। তিনি উঠে পড়বার জন্য উসখুস করেন।

সত্যসুন্দর তখনও তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন বলে একটা কিছু বলতেই হয়। প্রায় কিছু না ভেবেই তিনি তা বলে ফেললেন, স্যার, আপনার মতে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি?

সত্যসুন্দরের ঠোঁটটা আবার বেঁকে গেল। অর্থাৎ এটা একটা খুব বাজে প্রশ্ন। সামান্য লোকেরাই এই ধরনের কথা বলে।

সত্যসুন্দরকে চুপ করে থাকতে দেখেও বিমল সেন ছাড়লেন না। তিনি বললেন, মানুষ খায় দায়, ঘুরে বেড়ায়, ঝগড়াঝাঁটি করে, বংশ বৃদ্ধি করে—কিন্তু অনেকেই চিন্তা করে না, জীবনের উদ্দেশ্য কি। আপনার কি মনে হয় না, প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের একটা উদ্দেশ্য থাকা উচিত?

সত্যসুন্দর একটু রুক্ষভাবে বললেন, মানুষ বলতে কি বোঝায়? সব মানুষ কি এক? আপনি, আমি, প্রবীর চক্রবর্তী কিংবা ডঃ রাধাকৃষ্ণান, পল্টু বেয়ারা, ইরানের শা, আপনার বাড়ির ঝি কিংবা বোম্বের কোনো অ্যাকট্রেস, ধরুন, বৈজয়ন্তীমালা—এরা কি সবাই মানুষ হিসেবে একরকম যে সকলের একরকম উদ্দেশ্য থাকবে?

—তবু, সাধারণভাবে মানুষ হিসেবে সকলেরই তো জীবনের একটা কিছু উদ্দেশ্য থাকা দরকার।

—সে সম্পর্কে ঋষি-টৃষিরাই তো অনেক কথা বলে গেছেন। আমি আর নতুন করে কি বলবো?

—তবু আপনার মতামতটা শুনতে চাই। আপনি নিজেও জীবনে নিশ্চয়ই কোনো একটা উদ্দেশ্য খুঁজেছেন।

বিমল সেন আসলে সূক্ষ্ম তোযামুদি করছেন সত্যসুন্দরকে। তিনি দেখাতে চাইছেন, এরকম বড় বড় ব্যাপারে সত্যসুন্দরের মতামত জানার জন্য তিনি কতটা আগ্রহী। সত্যসুন্দরকে তোষামোদ করার কোনো প্রয়োজন নেই তাঁর, কোনো উপকারেরও আশা নেই—তবু অনেক মানুষের এরকম স্বভাব থাকে। সত্যসুন্দর এ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন বিমল সেনের দিকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বিমল সেন উৎসুকভাবে তাকিয়ে আছেন মুখের দিকে। কিছু একটা উত্তর না শুনে ছাড়বেন না!

তিনি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, আনন্দ। যে-রকমভাবে আনন্দ পায়।

—আপনি তা পেয়েছেন?

—হ্যাঁ পেয়েছি। একটা কুলি আনন্দ পায় সন্ধের পর গঙ্গার ধারে বসে গাঁজা টেনে, আর আমি আনন্দ পাই অন্য গ্রন্থকারের যুক্তির খণ্ডন করে। তবে, আনন্দের তো শেষ নেই। বাকি জীবনটাও সেই আনন্দেরই অনুসন্ধান করে যাবো।

—তা হলে যারা ডাকাতি করে কিংবা মানুষ খুন করে!

—হ্যাঁ। তাদের যতক্ষণ না কেউ অন্য আনন্দের সন্ধান দিচ্ছে, তারা তো ওই নিয়ে থাকবেই। চিরকালই এ রকম দেখা গেছে। তবে, ডাকাতও সন্ন্যাসী হয় এক সময়—এ রকম উদাহরণও কি নেই?

ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে ওঠায় আলোচনা আর এগুলো না। বিমল সেন এই সুযোগে উঠে পড়লেন।

সত্যসুন্দরের নির্দেশ দেওয়া আছে যে, বিশেষ জরুরী ব্যাপার না হলে অপারেটার যেন তাঁর ঘরে টেলিফোন না বাজায়।

টেলিফোন করেছে সত্যসুন্দরের স্ত্রী লীলা।

সত্যসুন্দর কণ্ঠস্বর মধুর করে প্রশ্ন করলেন, কি, এতক্ষণে দিবা নিদ্রা ভাঙলো?

লীলা: আজ দুপুরে ঘুমোই নি। সারা দুপুর জেগে আজ শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' বইখানা পড়লাম। আগে পড়ি নি তো।

সত্যসুন্দর: শরৎবাবুর সৌভাগ্য। কেমন লাগলো।

লীলা: একদম বাজে। শুধু বকবকানি।

সত্যসুন্দর: তোমার বিচারবুদ্ধির ওপর আমার শ্রদ্ধা হচ্ছে।

লীলা: এই, তুমি আজ কখন ফিরবে বাড়িতে?

সত্যসুন্দর: যথারীতি সাড়ে ছ'টায়।

লীলা: সাড়ে পাঁচটা কি পৌনে ছ' টায় আসতে পারো না?

সত্যসুন্দর: কেন?

লীলা: থিয়েটার দেখতে যাবো ভাবছি। 'রাজা অয়দিপাউস' নাকি খুব ভালো হয়েছে। তোমারও ভালো লাগবে।

সত্যসুন্দর: আজ অন্য কোনো সঙ্গী জুটলো না?

লীলা: কাকে আর পাবো। তুমি চলো, লক্ষ্মীটি। তোমার ভালো লাগবে, গিয়েই দেখো না।

সত্যসুন্দর: ভালো লাগার জন্য কষ্ট করে থিয়েটার হল পর্যন্ত যেতে হবে কেন? নাটকখানা বাড়িতে বসে পড়লেই তো একই আনন্দ পাওয়া যায়। আমি পাই।

লীলা: ধ্যাৎ! যাবে কিনা বলো!

সত্যসুন্দর দু'এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তাঁর ঠোঁটে দেখা দিল একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা। তাঁর মনে হলো, এই লীলা যেন তাঁর স্ত্রী নয় এবং তিনিও যেন সত্যসুন্দর নন, অন্য কোনো মানুষ। সাধারণ সংসারী লোকের মতন তিনি টেলিফোনে স্ত্রীর সঙ্গে সিনেমা থিয়েটার বিষয়ে আলোচনা করছেন। কিন্তু তাঁর খারাপ লাগছে

না। ব্যাপারটা বেশ উপভোগই করছেন। আজ তার মেজাজ প্রসন্ন আছে।

তিনি বললেন, থিয়েটার দেখার বদলে আজ সন্ধেবেলা দু'জনে বারান্দায় বসে অনেকক্ষণ গল্প করলে কেমন হয়? আমি তোমাকে রাজা অয়দিপাউস সম্পর্কে অনেক গল্প শোনাতে পারি।

লীলা: বাঃ, আমি বুঝি বাড়ি থেকে বেরুবো না?

সত্যসুন্দর: আজ না-ই বা বেরুলে।

লীলা: তুমি তো সারাদিন বাড়ির বাইরে কাটিয়ে আসো। আমার যে সব সময় বাড়ির মধ্যে বসে থাকতে দম বন্ধ লাগে।

সত্যসুন্দর: এমন অনেক সময় গেছে, যখন আমি পনেরো-কুড়িদিনের মধ্যে পড়ার ঘর ছেড়ে একবারও এক পাও বাইরে যাই নি।

লীলা: তোমার কথা আলাদা। তুমি মহাপুরুষ।

সত্যসুন্দর: মহাপুরুষরা কি স্ত্রীর সঙ্গে থিয়েটার দেখতে যায়? স্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের বাক্যালাপ কি রকম হয় বলো তো?

লীলা: তুমি আমাকে আজ নিয়ে যাবে কি না বলো।

সত্যসুন্দর: তুমি অন্য কারুর সঙ্গে যেতে পারো না আজ?

লীলা: তার মানে তুমি আমাকে নিয়ে যাবে না, এই তো? আমার অনুরোধের বুঝি কোনো দাম নেই?

লীলা এবার অভিমান দেখাবার চেষ্টা করছে। স্বামীর ওপর সে জোর খাটাতে পারে না। কোনোদিন সে সত্যসুন্দরকে হুকুম করে কথা বলতে পারবে না। শুধু এই এক অস্ত্র আছে, অভিমান, সামনা-সামনি থাকলে, লীলা ঠিক এতক্ষণে চোখ দিয়ে জল বার করতো। লীলা জানে, সত্যসুন্দর যতই কঠোর হোক, কিন্তু কান্নাকাটি একেবারে সহ্য করতে পারেন না।

সত্যসুন্দর : আচ্ছা, আমি বাড়িতে যাচ্ছি। তারপর মনস্থির করবো।

সত্যসুন্দর টেলিফোন রেখে দিয়ে আবার চুরুট ধরালেন।

আটাশ উনত্রিশ বছরের কোনো নারী বা পুরুষ আটান্ন বছরের কোনো রাসভারী ব্যক্তিকে তুমি সম্বোধন করে এমন চটুলভাবে কথা বলে না। নিজের স্ত্রী হলে আলাদা কথা। লীলা আবার সত্যসুন্দরের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী।

সত্যসুন্দর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আপন মনে বিড়বিড় করে বললেন, সকলের আনন্দ এক রকম নয়।

॥ ২ ॥

সত্যসুন্দর প্রথম বিয়ে করেন আটত্রিশ বছর বয়েসে। সে ছিল একটি জার্মান যুবতী। দৈত্য রমণীর মতন চেহারা—সত্যসুন্দরের সঙ্গে বেশ মানিয়েছিল। তবু বিয়েটা তিন বছরের বেশী টিঁকলো না। চার বছরের মধ্যেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল। ওলগা তার পরেও আরও দু'বার বিয়ে করেছে। সব মিলিয়ে এখন তার তিনটি সন্তান, তার মধ্যে একটিও সত্যসুন্দরের নয়। ওলগা এখনো সত্যসুন্দরকে ডার্লিং সম্বোধন করে চিঠি লেখে।

তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম ছিল লীলা পরাঞ্জপে। মারাঠী মেয়ে, ছোটখাটো চেহারা, দারুণ বুদ্ধিমতী এবং স্নেহপরায়ণা। লীলা পরাঞ্জপে হয়ে উঠেছিল সত্যসুন্দরের যোগ্য সহধর্মিণী। স্বামীর কাজে সব রকম সাহায্য করতে পারতো সে, আবার তাঁর সব রকম পাগলামিও মেনে নিত। সত্যসুন্দরের শারীরিক কামনা-বাসনা অত্যন্ত প্রবল।

সত্যসুন্দর একজন জ্ঞানীপুরুষ কিন্তু সাধুপুরুষ নন্। তিনি প্রচণ্ড রকমের ভোগী। নিজের ঠিক পছন্দ মতন আহার্য এবং শয্যা তাঁর চাই-ই। এক সময় তিনি নিদারুণ দারিদ্র্য সহ্য করেছেন, এখনো তিনি প্রয়োজন হলে খোলা মাঠে শুয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু নিজের বাড়িতে তাঁর বিছানার চাদরটি ধপধপে সাদা রঙের না হলে তিনি রাগারাগি করবেন। নারী সম্পর্কে তাঁর আসক্তি অত্যন্ত প্রবল। নারীর ভালোবাসা এবং শারীরিক মিলনের আনন্দ তাঁর কর্মে প্রেরণা দেয়। যত বয়েস বাড়ছে ততই এটা বেশী করে বুঝছেন। তিনি নিজের কাজ নিয়ে একটানা সাত আটদিন প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে পারেন, কিন্তু তারপর কোনো নারীর সঙ্গে রতিলীলায় উদ্দাম হয়ে ওঠার জন্য তাঁর মন ছটফট করবে।

ইওরোপে যখন ছিলেন তখন নারীর সাহচর্য পাওয়া সহজ ছিল। তাঁর সংস্পর্শে যে সব মহিলা এসেছে, তাদের সকলকেই তিনি শয্যা-সঙ্গিনী হবার প্রস্তাব দিয়েছেন—অনেকেই মেনে নিয়েছে। যারা মেনে নেয় নি, তাদের তিনি বিদায় দিয়েছেন সসম্মানে। অনেক বিদূষী রমণী কিংবা তার অনেক ছাত্রীকেও তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে শারীরিক সম্পর্ক ব্যতিরেকে কোনো নারীর সঙ্গে নিভৃতে জ্ঞানচর্চা করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

এ দেশে বিবাহ সম্পর্কহীন সঙ্গিনী পাওয়া কঠিন। অনেক ধনাঢ্য লোক কিংবা বিখ্যাত লোকও গোপনে রক্ষিতা রাখে, সমাজ তা মেনে নেয়—কিন্তু প্রকাশ্যে কোনো নারীর বন্ধুত্ব ও সাহায্য কামনা করলেই যেন সমাজের পায়সান্নে চোনা মিশে যায়। সুতরাং বিবাহ ছাড়া গতি নেই। বিবাহ জিনিসটাকে সত্যসুন্দর তেমন একটা পছন্দ করেন না, তবু মেনে নিতে হয়েছে।

ইচ্ছে করলে তিনি বিদ্রোহ করতে পারতেন। কোনো রকম সামাজিক ব্যবস্থার ওপরেই তাঁর ভক্তি নেই। তাঁর ধারণা, সামাজিক

বন্ধনগুলি শুধু ব্যক্তিত্বহীন সাধারণ মানুষের জন্য। তাঁর মতন অসাধারণ মানুষ চলবেন নিজস্ব নিয়মে। তবে, সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে অনেক সময় নষ্ট হয়। তিনি সমাজ সংস্কারক হলে নিশ্চয়ই সে-রকম করতেন। কিন্তু সমাজ সম্পর্কে তাঁর মাথা-ব্যথা নেই। তিনি যতদূর সম্ভব অন্যদের এড়িয়ে চলতে চান।

আপাতপক্ষে সত্যসুন্দরকে বেশ স্বার্থপর মনে হয়। নিজের ভালো লাগার ওপর তিনি বড় বেশী জোর দেন, পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে প্রায় অন্ধ, নিজেকে বাদ দিয়ে বাকি জগৎ-সংসার সম্পর্কে তাঁর একটা পরিহাস-মিশ্রিত নির্দিষ্ট ধারণা আছে। তিনি নিজে কারুর কাছে যেমন কখনো কৃপা চাইতে যান নি, তেমনি তাঁর কাছে কেউ দাক্ষিণ্য চাইতে এলে তিনি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করেন। তবে, তিনি সজ্ঞানে অন্তত অন্য কারুর কোনো কাজে বাধার সৃষ্টি করেন না।

সত্যসুন্দর দারিদ্র্য ও প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করেও শেষ পর্যন্ত জিতেছেন, এখন তাঁর ইচ্ছে মতন জীবন-যাপন করার সুযোগ আছে—কিন্তু এটা যে প্রকৃতির নিয়ম নয়, একটা ব্যতিক্রম মাত্র, এটা কিছুতেই মানতে চাইবেন না। যারা নিজস্ব পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি, তাদের তিনি করুণা করেন।

লীলা পরাঞ্জপেও ছিল সাধারণ ঘরের মেয়ে। তবু বহু রকম সংস্কার কাটিয়ে উঠে সে সত্যসুন্দরের মন জয় করতে পেরেছিল।

সত্যসুন্দর বাচ্চা ছেলেমেয়ে পছন্দ করতেন না আগে। বাচ্চা-কাচ্চার ঝামেলা নিয়ে সংসার করা তাঁর মতন লোককে মানায় না। কিন্তু লীলা একটি সন্তান চেয়েছিল। সেই সন্তানের জন্ম দিতে গিয়েই লীলা মারা যায়। তখন লীলার বয়েস সাঁইত্রিশ বছর—ওই বয়সে প্রথম সন্তান হলে একটু বিপদের ঝুঁকি থাকেই। লীলার মৃত্যুতে সত্যিকারের আঘাত পেয়েছিলেন সত্যসুন্দর। বাচ্চাটা বেঁচে

ছিল আরও পাঁচদিন। তারপর থেকে অন্যের বাচ্চাদের দেখলে সত্যসুন্দরের হাত আদর করার জন্য এগিয়ে যায়।

বাহান্ন বছর বয়েসে তিনি তৃতীয়বার বিয়ে করলেন। এই মেয়েটির নাম আগে ছিল সবিতা। তিনি নাম বদলে লীলা রেখেছেন। প্রথমত, মেয়েদের নাম হিসেবে সবিতা—তাঁর কাছে একটা অসহ্য ব্যাপার। তাছাড়া, তাঁর আগের স্ত্রী লীলার স্মৃতিকে তিনি টিঁকিয়ে রেখেছেন এইভাবে। এর নাম অন্য কিছু রাখলে তিনি নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে একে ভুল করে লীলা বলে ডেকে ফেলতেন।

লীলা বাঙালী হলেও উত্তরপ্রদেশে মানুষ। বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে খুব বেশী যোগ নেই। সত্যসুন্দর এলাহাবাদে উত্তরপ্রদেশ সরকারের হয়ে আর একটা কাজ করছিলেন যখন, সেই সময় লীলা তাঁর কাছে চাকরি করতে আসে। সরল সাদাসিধে মেয়ে, খানিকটা অসহায়। চেহারা বেশ সুশ্রী। হঠাৎ পারিবারিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ওদের অনেকগুলো ছোট ছোট ভাইবোন।

লীলা অর্থাৎ সবিতা কাজকর্ম কিছুই জানতো না, সামান্য দু' ছত্র ইংরেজী লিখতে গেলেও তিনটে বানান ভুল। সত্যসুন্দরের বিবেচনায় তাকে অবিলম্বে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা উচিত।

সত্যসুন্দর একদিন তাকে নিজের কামরায় ডেকে সোজাসুজি বলেছিলেন, তোমাকে আর চাকরি করতে হবে না। তোমাকে কয়েকটা কথা বলছি, মন দিয়ে শুনে দু' দিন পরে উত্তর দিও। 'তুমি ইচ্ছে করলে আমার বাড়িতে থাকতে পারো। আমার বাড়িতে কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। সংসারের ভার তোমাকেই নিতে হবে। দু'তিনজন দাস-দাসী আছে, তারা তোমার হুকুম শুনবে। তোমার বিলাসিতার জন্য ভালো হাতখরচ পাবে। তোমার কোনো কিছুই অভাব থাকবে না। আমি তোমার জন্য শিক্ষক রেখে দেবো—তার

কাছে পড়াশুনো করবে। এতে তুমি রাজি কিনা ভেবে দেখো নিজে। আগেই বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করার কোনো দরকার নেই।

অপমানে লজ্জায় লীলা ঘাড় হেঁট করে ছিল। মুখখানা টকটকে লাল। সত্যসুন্দর যা বললেন, তার একটাই অর্থ হয়। তিনি মেয়েটিকে রক্ষিতা রাখতে চাইছেন। সাধারণ ঘরের মেয়েরা বরং অসহায় অবস্থায় পড়লে আত্মহত্যা করে কিন্তু প্রকাশ্যে অসতী হতে চায় না। তা ছাড়া, পারিবারিক বন্ধন এমন তীব্র যে বাবা-মায়ের মনে কষ্ট দেবার কথা ভেবেই তারা অনেক সাধ-আহ্লাদ বিসর্জন দিতে পারে অনায়াসে।

সত্যসুন্দর এটা একটু বাদে বুঝতে পেরে দ্রুত সংশোধন করে নিলেন নিজেকে। বললেন, অর্থাৎ আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

ব্যাপারটা নিয়ে বেশ সোরগোল পড়ে গিয়েছিল। সম্মানিত ব্যক্তি সত্যসুন্দর আচার্য তাঁর চেয়ে তিরিশ বছরের ছোট একটি মেয়েকে বিয়ে করছেন, এর চেয়ে সরস আলোচনার বিষয় আর কি হতে পারে! কিন্তু আলোচনা ও টীকা-টিপ্পনীর স্তরেই সেটা নিবদ্ধ থাকে—কারণ, যেহেতু বিয়ে, তাতে বাধা দেবার উপায় নেই কোনো।

সত্যসুন্দর কিছুই গ্রাহ্য করেন নি। বয়েসের প্রশ্নটা খুবই অবান্তর তাঁর কাছে। যৌবনকে খুব বেশী সম্মান দেবার কোনো অর্থ হয় না। যৌবনে বুদ্ধি অপরিণত থাকে। তিনি তো হাজার হাজার যুবককে দেখছেন। সাধারণ একটা বিচার-বুদ্ধি পর্যন্ত নেই। আর শারীরিক দিক থেকেও তিনি যুবক কম কিসে?

সেই বাহান্ন বছর বয়েসেও তাঁর স্বাস্থ্য অটুট। কোনো রোগ-ব্যাধি নেই। সিঁড়ি ভেঙে অনায়াসে পাঁচ ছ' তলা উঠতে পারেন, পরিশ্রম করতে পারেন অসুরের মতন। তাঁর সঙ্গে পাঞ্জা লড়লে বহু যুবক হেরে যাবে। তাঁর যৌনক্ষমতাও আগের মতন আছে।

একমাত্র একটা কথা উঠতে পারে, কোনো যুবক স্বামীর তুলনায় সত্যসুন্দরের আগে মৃত্যু হতে পারে। তা হোক না। তিনি তাঁর স্ত্রীর জন্য যথেষ্ট অর্থের সংস্থান রেখে যাবেন। তাছাড়া, দেশে বিধবা-বিবাহ আইন চালু আছে। লীলা স্বচ্ছন্দে আবার বিয়ে করতে পারে, তেমন কিছু হলে।

নারীহীন গৃহ সত্যসুন্দর সহ্য করতে পারেন না। শুধু চাকর-বাকর-ঠাকুর নিয়ে পুরুষশাসিত সংসারে থাকলে স্বভাব রুক্ষ হয়ে যায়। সত্যসুন্দর মাঝে মাঝে নারীসঙ্গ কামনা করেন। পড়াশুনো করতে করতে এক এক সময়ে মাথার মধ্যে একটা অস্থিরতা দেখা দেয়, তখন নারীর স্পর্শে অপরূপ শান্তি পাওয়া যায়।

তৃতীয় পক্ষের বিয়ের সময় নানারকম কৌতুকজনক ঘটনা ঘটেছিল। তখন তিনি এলাহাবাদে সরকারের আর একটি কমিশনের সভাপতি। বিদেশে খুব নামডাক হওয়ার ফলে দেশেও খুব খাতির হয়েছে। কিন্তু সবাই জানে তিনি অতিশয় দুর্মুখ ও স্পষ্টভাষী। মন্ত্রীদেরও গ্রাহ্য করেন না। সেই মানুষ যখন আবার একটি বাচ্চা মেয়েকে বিয়ে করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, তখন অনেকেই তাতে রোমান্সের গন্ধ পেয়েছিল। কাগজের রিপোর্টাররা উঠে পড়ে লেগেছিল ভেতরের খবর বার করার জন্য। পাঠকরা কেচ্ছা পড়তে ভালোবাসে।

কিন্তু ব্যাপারটা ছিল খুবই রসকষহীন। সত্যসুন্দর বিয়ে করলেন না যেন একটা পরীক্ষা চালালেন। গরীব ঘরের একটি অতি সাধারণ মেয়েকে তুলে এনে বিয়ে করে তারপর যদি তাকে সব রকম শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে কি সে একজন বিদ্বান প্রতিষ্ঠিত পুরুষের যোগ্য সহধর্মিণী হতে পারে! সত্যসুন্দরের আগের দুই স্ত্রীই ছিল রীতিমতন বিদুষী, তাঁর কাজকর্মে সব রকম সাহায্য করতে পারতো। সেই তুলনায় লীলা একটি অতি সাধারণ মেয়ে, তার প্রায় কোনো

যোগ্যতাই নেই বলা যায়। সত্যসুন্দর ইচ্ছে করলে অবশ্য আবার আর কোনো মেয়ে-গবেষক কিংবা অধ্যাপিকাকে বিয়ে করতে পারতেন—সেরকম অবিবাহিত নারীরও অভাব নেই। কিন্তু লীলা অর্থাৎ সবিতার একমাত্র যোগ্যতা তার যৌবন। সত্যসুন্দর যৌবনের সংস্পর্শ চান। যৌবনের আকর্ষণই আলাদা। সবিতাকে খুব তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে এনে তাকে পরিবর্তিত করে তোলার জন্য তিনি ছটফট করছিলেন।

কিছুক্ষণের জন্য সত্যসুন্দরের তৃতীয় বিবাহের সময়কার দিনগুলিতে ফিরে যাওয়া যাক।

॥ ৩ ॥

সকালবেলা বেশ কিছু দর্শনার্থী আসে। সেদিনও এসেছিল আট-দশ জন। সকলে বসবার ঘরে বসে স্লিপে নাম ও প্রয়োজন লেখে, সত্যসুন্দরের সেক্রেটারি এক এক করে ভেতরের ঘরে পাঠায়।

সেদিন তিনি ওপর থেকে নামতে একটু দেরি করেছেন। নিজের কামরায় ঢোকার আগেই বসবার ঘরে ভিড় জমে গেছে। এরা অনেকেই চাকুরিপ্রার্থী ও ঠিকাদার। সত্যসুন্দর জমানো স্লিপগুলো তুলে নামগুলো পড়ে নিলেন একবার। সাক্ষাৎপ্রার্থীদের মধ্যে একজন তাঁর ভাবী শ্বশুর।

কিন্তু সেই নাম দেখেও সত্যসুন্দর বিন্দুমাত্র উতলা হলেন না। ভাবী শ্বশুরকে আগে-ভাগে খাতির করার কথাও তাঁর মাথায় এল না। তিনি জীবনের প্রতিটি পদে নিয়ম-শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী। সেক্রেটারিকে বললেন, পর পর ডাকো।

একজন একজন করে আসতে লাগল প্রার্থীরা। প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবলের ওপাশে বসে সত্যসুন্দর সব শুনতে লাগলেন, কারুকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন, কারুকে বা বিদায় করে দিলেন কঠোর ভাষায়। সত্যসুন্দরের বিশাল চেহারা, চোখে প্রায় আধ ইঞ্চি চওড়া ফ্রেমের চশমা, গমগমে কণ্ঠস্বর। তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে সাহস করে না কেউ।

তাঁর ভাবী শ্বশুরকে প্রায় সওয়া ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল। তারপর ডাক পড়ল।

লোকটিকে প্রথম নজরে দেখেই সত্যসুন্দর অপছন্দ করে ফেললেন। যে-সব লোকের মুখে সব সময় বিনয়ের একটা তেলতেলে ভাব থাকে, তিনি তাঁদের কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। তিনি পছন্দ করেন স্পষ্টবক্তা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মানুষ।

সত্যসুন্দর চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা চুরুট ধরালেন। তাঁর ভাবী শ্বশুর তখনও দাঁড়িয়ে, তিনি অধস্তন কর্মচারীকে যে-সুরে নির্দেশ দেন, সেই সুরে বললেন, বসুন।

সত্যসুন্দরের ভাবী শ্বশুরের নাম দীননাথ। লোকটি অতিশয় রোগা ও বেঁটে। বাচ্চা ছেলে বলে মনে হয়, যদিও এর গালটি তোবড়ানো এবং বয়েস পঞ্চাশের বেশী। পাঁচ-ছ'টি ছেলে-মেয়ের জন্ম দিয়ে তাদের ঠিক মতন ভরণ-পোষণ করতে না পারার জন্য লোকটি যেন সব সময় অপরাধী হয়ে আছে।

সত্যসুন্দর ভাবলেন, আশ্চর্য তো, যে-সব লোকের নাম দীননাথ হয়, তারা সাধারণত দীনই থেকে যায়, কখনো নাথ আর হতে পারে না। এই লোকটি পৃথিবীতে আর কিছুই করতে পারে নি, শুধু কয়েকটি ছেলে-মেয়ের জন্ম দিয়েছে। সম্ভবত এর স্ত্রীর শরীরের গড়ন ভাল, সেই জন্যই ছেলে-মেয়েরা মোটামুটি সুশ্রী। কিংবা তাদের মধ্যে দু'একটি অবৈধ সন্তানও হতে পারে, আশ্চর্য কিছু নয়।

যেন ইণ্টারভিউ নিচ্ছেন, এই সুরে সত্যসুন্দর ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি বলার আছে বলুন ?

দীননাথ এর মধ্যেই হাত কচলাতে শুরু করেছে। অত্যন্ত মিনমিনে গলায় বলল, স্যার, আমি কি আর বলব—

সত্যসুন্দর বুঝলেন, এই সব লোক কোনো কথাই স্পষ্ট করে বলতে পারে না, ভণিতা করেই সময় কাটিয়ে দেয়। কিন্তু তিনি ব্যস্ত মানুষ, অযথা সময় নষ্ট করতে রাজী নন।

চুরুটের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার সম্পর্কে সবকিছু জানেন ?

দীননাথ সেই রকম মিনমিনে গলায় বলল, আজ্ঞে স্যার, আপনার সম্পর্কে ইয়ে, কে না জানে ? আপনি এতবড় একজন—

সত্যসুন্দর তাঁর ভাবী শ্বশুরকে এবার রীতিমত ঘৃণা করতে শুরু করলেন। যে-লোক তার ভাবী জামাইকে স্যার বলতে পারে এবং হাত কচলায়, সে কি মানুষ ? অন্য কেউ হলে সত্যসুন্দর এক ধমক দিতেন। কিন্তু তিনি তার ভাবী শ্বশুরকে এইটুকু অন্তত সম্মান করলেন।

গলার স্বর একরকম রেখেই জিজ্ঞেস করলেন, কি কি জানেন ?

—এই মানে, ইয়ে—

—শুনুন, আমি নিজের মুখেই বলছি। আপাতত আমি একটি সরকারী চাকরি করছি, আমার মাইনে এখন সব কেটেকুটে তিন হাজার দুশো টাকা। যখন এই চাকরি করি না, তখন বিদেশে পড়াতে কিংবা বক্তৃতা দিতে যাই। সে সময় আমার রোজগার আরও বেশী হয়। আমার একলক্ষ টাকার লাইফ ইনসিওরেন্স আছে, কলকাতায় একখানা তিনতলা বাড়ি আছে। ইংরেজী ও জার্মান ভাষায় আমার সাতখানা বই আছে, তার থেকেও কিছু আয় হয়।

দীননাথের মুখ প্রায় হাঁ হয়ে এসেছে। চোখ দুটি বিস্ফারিত।

সত্যসুন্দর জানতেন, তাঁর এই সব কথায় কি রকম প্রতিক্রিয়া হবে। তিনি আগেই গোপনে দীননাথের সাংসারিক অবস্থা সম্পর্কে সব রকম খবর নিয়ে রেখেছেন। লোকটি জীবনে কখনো একসঙ্গে এক হাজার টাকা দেখেছে কিনা সন্দেহ।

সত্যসুন্দর আবার শুরু করলেন। চুরুটের ছাই সন্তর্পণে ঝেড়ে তিনি বললেন, এবার আমার অন্য পরিচয়। আমার বয়েস বাহান্ন, কখনো কোনো শক্ত রোগ হয় নি। আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। এর আগে আমি দু' বার বিয়ে করেছিলাম, সন্তানাদি কিছু হয় নি। এক স্ত্রী মারা গেছে, অন্য স্ত্রী বিদেশিনী, বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে অনেক দিন আগে, কোনো ভরণ-পোষণ দিতে হয় না। এবার বলুন, আপনি কেন এসেছেন ?

দীননাথ ভীতচকিতভাবে বললো, আজ্ঞে ?

—আপনি আমার কাছে উপযাচক হয়ে কেন এসেছেন ? আমি আপনার মেয়েকে বিবাহ করাত চাই। সাধারণ রীতি অনুযায়ী আমি নিজেই আপনার কাছে অনুমতি চাইতে যেতাম। তার বদলে আপনি নিজেই এসেছেন। আপনার কি কোনো দাবি আছে ?

—না, না, সে-সব কিছু বলতে আসি নি।

—তা হলে শুনুন, পাত্রপক্ষ হিসেবে আমার একটা দাবি আছে।

—আপনার দাবি ?

—হ্যাঁ। আপনার মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাইছি, তার বিশেষ একটি কারণ আছে। আপনার মেয়ে এমন কিছু রূপসী নয়, তার বিশেষ কোনো গুণও নেই। আমার যদিও তৃতীয় পক্ষ এবং বয়েস যথেষ্ট বেশী হয়েছে, তবু এদেশে আমার মতন সঙ্গতিসম্পন্ন লোক যথেষ্ট সুন্দরী তরুণী ভার্যা পেতে পারে। এদেশে বিয়ের নামে এখনও মেয়ে কেনা-বেচা হয়। আমি পছন্দ মতন একটি মেয়েকে কিনতে পারতাম। কিন্তু আপনার মেয়ে সবিতাকে আমি বিয়ে

করছি অন্য কারণে। সে আমার অফিসে চাকরি করে। আমার ঘরেই বসে। কাজে ডুবে গেলে আমার ঘড়ির কাঁটার কথা খেয়াল থাকে না। অনেক সময় সাতটা-আটটা বেজে যায়। একজন পুরুষ-মানুষের সঙ্গে একজন মোটামুটি স্বাস্থ্যবতী নারী এক ঘরে যদি অনেকক্ষণ থাকে, তা হলেই সেটা অন্যদের চক্ষুশূল হয়। লোকে সত্যি-মিথ্যে মিলিয়ে নানা কথা বলে। লোকের জিভ সুলসুল করে। এতে আমার কোনো ক্ষতি হবে না, ক্ষতি হবে আপনার মেয়েরই বেশী। মেয়েদের গায়েই কলঙ্ক লাগে। সমাজ পুরুষদের শাস্তি দেবার ক্ষমতা আর রাখে না।

সত্যসুন্দর হঠাৎ থেমে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, কথাগুলো বক্তৃতার মতন হয়ে যাচ্ছে। মুখ নীচু করে তিনি বললেন, যাক গে, সব দিক ভেবে-চিন্তে আমি দেখলাম, হয় মেয়েটিকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে একটি পুরুষ টাইপিস্ট রাখতে হয়, অথবা তাকে বিয়ে করতে হয়। সুতরাং আমি বিয়ে করার কথাটাই ঠিক করলাম। আমি জিতেন্দ্রিয় পুরুষ নই, আমারও নারীসঙ্গ প্রয়োজন।

তিনি আবার একটু থামতেই দীননাথ বলল, আপনার দাবিটা—

—ও হ্যাঁ। আমার দাবি হচ্ছে, বিয়ের পর আপনার মেয়ে আপনাদের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখতে পারবে না। আমি সামাজিকতায় বিশ্বাস করি না। আমি বাড়িতে সম্পূর্ণ নিজের রুচিতে থাকতে চাই; বিয়ের পর যে-কোনো সময় আমি এখান থেকে আবার অন্যত্র চলে যেতে পারি। কিন্তু আপনার মেয়ে আর কখনো বাপের বাড়ি যাবে না।

দীননাথ এতক্ষণ পর একটু শ্বশুর হবার ভাব দেখাল। সে বলল, এ যে বড় শক্ত দাবি। গরীবের মেয়ে হলেও ছোটমেয়ে তো, সে তার মায়ের খুব আদরের। তার মাকে জিজ্ঞেস না করে তো—

সত্যসুন্দর মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, আপনি আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে আসুন। তিনি রাজী কিনা আমাকে জানাবেন। তিনি যদি এ শর্তে রাজী না হন তা হলে আমাকে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

—অন্য ব্যবস্থা মানে?

—এই বিয়ে হবে না।

সত্যসুন্দর উঠে দাঁড়ালেন। অর্থাৎ ইন্টারভিউ শেষ হয়ে গেছে, এবার প্রার্থী যেতে পারে।

দীননাথ ভয় পেয়ে গেল। এ বিয়ে হবে না, তা কি কল্পনা করা যায়? মেয়ের বিয়ে দেবার সামর্থ্যই তার নেই। এত বড় বড়লোক—

দীননাথ ব্যস্ত হয়ে বললো, না, না, আমি জানি, ওর মা রাজী হবে। ঠিকই রাজী হবে। মেয়ের কল্যাণ কোন্ মা না চায়। আপনার মতন এমন পাত্র—

—ঠিক আছে, তা হলে দিন ঠিক করুন। আমি মন্ত্র-পড়া বিয়েতে বিশ্বাস করি না। এই বয়েসে মাথায় টোপরও পরতে পারব না। বিয়ে হবে রেজিস্ট্রি করে।

—কিন্তু আমাদের পরিবারে একটা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান ছাড়া—

—আপনাদের পরিবারে আপনারা যা ইচ্ছে করতে পারেন, তার মধ্যে আমি নেই।

—আত্মীয়-স্বজনকে অন্তত ডেকে খাওয়াতে যদি না পারি—

—বেশ তো খাওয়ান না।

—হাতে একটি পয়সা নেই। জানেন তো আমার অবস্থা। সংসারই চলে না।

সত্যসুন্দর হাত তুলে তাকে চুপ করতে বললেন। টেবিলের ড্রয়ার থেকে বার করলেন চেক-বই। কলম খুলে টাকার অঙ্কটা বসাতে গিয়ে

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন। লিখলেন এক হাজার। তারপরেই আবার সেই চেকটা ছিঁড়ে ফেলে আর একটাতে লিখলেন পাঁচ হাজার।

চেকটা দীননাথের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এতে হয়ে যাবে আশা করি ?

দীননাথের হতভম্ব ভাবটা কাটবার পর্যন্ত সময় দিলেন না তিনি। বললেন, আচ্ছা, আপনি পরে আমাকে তারিখটা জানিয়ে যাবেন। অন্য অনেক লোক বসে আছে—

দীননাথ চলে যাবার পর আরও তিনজন দর্শনপ্রার্থীর সঙ্গে কথা বলতে হল সত্যসুন্দরকে। সব শেষ করে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তাঁর মুখে একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠল।

ব্যাপারটা কেনা-বেচার মতনই দাঁড়াল। সবিতাকে তিনি কিনে নিলেন তার পরিবার থেকে। পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে। না, আরও বেশী। সবিতার জন্য কিছু গয়নাপত্তর ও শাড়িও তাঁকেই কিনতে হবে। সবিতার বাবা নিশ্চয়ই ভাবছে, তিনি মারা গেলে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি সব এই মেয়েই পাবে—অর্থাৎ ওরাই এসে লুটেপুটে খাবে। মৃত্যুর পর কি হবে, সে সম্পর্কে সত্যসুন্দরের বিন্দুমাত্রও চিন্তা নেই।

তিনি আরও ভাবলেন, আমি কি একটি মহৎ মানুষ, না পাষণ্ড ? আমি মেয়েটির উপকার করলাম, না ক্ষতি করলাম ? এ দেশের অধিকাংশ মেয়েরই মন বলে কোনো বস্তু নেই। সবিতার সঙ্গে কথা বলে তিনি বুঝেছেন, তার জীবনের কোনো উচ্চাশা নেই, কোনো স্বপ্ন নেই। সে গরীব ঘরের মেয়ে, কোন রকমে বেঁচে থাকা এবং পরিবারের আর সকলকে বাঁচিয়ে রাখাই যেন তার একমাত্র চিন্তা। দীননাথ একবারও বলল না, তার মেয়ের নিজস্ব কোনো মতামত নেবার প্রয়োজন আছে কিনা। নির্লজ্জের মতন টাকা চাইল লোকটা। তাতে ব্যাপারটা আরও কেনা-বেচার মতন দেখাল।

সাত দিনের মধ্যে ঠিকঠাক হয়ে গেল বিয়ে। এরকম অদ্ভুত বিয়ে এলাহাবাদের বাঙালী সমাজে দেখেনি আগে। বিয়ের প্রথম দিনের অনুষ্ঠান হল বরের বাড়িতে। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার হলেন পুরোহিত। বহু লোক ভোজ খেয়ে গেল। এর পরের অনুষ্ঠান হল মেয়ের বাড়িতে। সেখানে বর অনুপস্থিত। সত্যসুন্দর কোনদিন শ্বশুরবাড়ি যান নি। আগের দুটি বিয়ের সময়েও না।

তিনদিন পর সবিতা এল সত্যসুন্দরের বাড়িতে থাকতে। এটাও সত্যসুন্দরের ইচ্ছা অনুযায়ীই হল। বিয়ের দিনই তিনি সবিতাকে বলে দিয়েছিলেন যে, সে যে-ক'দিন ইচ্ছে তার মা-বাবার সঙ্গে থেকে আসতে পারে। কিন্তু একবার যখন এ বাড়িতে আসবে আর ফিরতে পারবে না।

তিনদিন পরেই খুব সম্ভবত তার মা-বাবাই তাকে ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছে।

সেদিন সত্যসুন্দরের কর্মচারীরা ওঁকে কিছু না জানিয়ে ঘর-বাড়ি সাজিয়ে দিয়েছে ফুল দিয়ে। বিছানায় পর্যন্ত ফুল। যেন এইটাই ফুলশয্যা। সত্যসুন্দর সে ঘরে ঢুকে প্রথমে বেশ চমকে উঠলেন। ফুলটুল দেখে নয়, নতুন বউকে দেখে। বাপের বাড়ির কয়েকটা মেয়ে খুব সাজিয়ে-টাজিয়ে দিয়েছে সবিতাকে। তাকে দেখাচ্ছে অন্যরকম। সেই সাধারণ চেহারার মেয়েটা বদলে গেছে একেবারে। বিয়ের পর ঠিক এই ক্ষণটিতে সব মেয়েই কি সুন্দরী হয় ?

সত্যসুন্দর লক্ষ্য করলেন, সবিতার চোখে জল। তিনি ভুরু কোঁচকালেন। আঙুল দিয়ে তার থুতনিটা তুলে জিজ্ঞেস করলেন, কি, তুমি কাঁদছ কেন ?

সবিতা কোনো উত্তর দিল না। তার কান্না বেড়ে গেল আরও। সত্যসুন্দর তিন চার বার তাকে ওই প্রশ্নই করলেন, কোনো উত্তর দেয় না সে।

সত্যসুন্দর রেগে উঠলেন। কোন ব্যাপারের মর্ম বুঝতে না পারলেই তিনি বিরক্ত হন। নিজেকে সর্বজ্ঞ মনে করেন তিনি। একটি মেয়ের কান্নার মানে বুঝতে পারবেন না? এই মেয়েটিকে তিনি হীনতম দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার করে এনে নতুন জীবন দিচ্ছেন, আর সে তার কথার উত্তর দেবে না?

সত্যসুন্দর একবার ভাবলেন, ঠাস করে এক চড় মারবেন সবিতার গালে। তিনি হাতও তুলেছিলেন, থেমে গেলেন। আবার তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। এ কি সাংঘাতিক ভুল করছিলেন তিনি! রসশাস্ত্রও ভুলে যাচ্ছিলেন। নারী যদি স্বয়মাগতা না হয়, তাহলে কি সুখদা হতে পারে?

তিনি সবিতার হাত ধরে অত্যন্ত কাতর ভঙ্গি করে বললেন, তুমি কেঁদে কেন কষ্ট দিচ্ছ আমাকে? তুমি কি জানো না, আমি এতদিন তোমার জন্যই অপেক্ষা করে ছিলাম? তোমার মুখের একটা কথা শোনার জন্য, তোমার একটু হাসি দেখার জন্য···

সবিতা চোখ মুছল, মুখ তুলে তাকাল। সত্যসুন্দর আদর করে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, তুমি সুন্দর। আমি তোমাকে কোনো কষ্ট দেব না। তুমি আমাকে ভয় পেয়ো না, আমি তোমার ভালবাসা চাই। আজ থেকে আমি তোমার নাম দিলাম লীলা।

সবিতা তখনও থরথর করে কাঁপছে। কয়েকদিন আগে পর্যন্ত যিনি ছিলেন তার অফিসের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, যার কলমের একটি খোঁচায় সবিতার চাকরি চলে যেতে পারতো, আজ তিনিই তার কাঁধে হাত দিয়ে নরম গলায় কথা বলছেন! এটা কি স্বপ্ন?

সত্যসুন্দর বললেন, তুমি চুপ করে আছো কেন? কথা বলবে না?

সবিতা কাঁপা কাঁপা গলায় উত্তর দিল, আমি কি বলবো? আমি তো কিছুই জানি না!

সত্যসুন্দর নবীনা স্ত্রীকে নিজের বুকের কাছে টেনে এনে বললেন, তোমাকে আর কিছুই জানতে হবে না। তুমি শুধু আমায় ভালোবাসবে। তুমি ভালোবাসতে জানো তো! এর আগে কোনো ছোকরা-টোকরার সঙ্গে তোমার ভালোবাসা হয় নি? তোমার কোনো ভয় নেই, আমি রাগ করবো না, সত্যি করে বলো!

সবিতা মুখ লুকিয়ে বললো, না!

—সত্যি?

—হ্যাঁ, সত্যি।

সত্যসুন্দর হা-হা করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, সে রকম ছোটখাটো এক আধটা অভিজ্ঞতা থাকলেই সুবিধে হতো। শোনো লীলা, আমি তোমাকে লেখাপড়া শেখাবো, আদব-কায়দা শেখাবো—অনেক কিছুই শেখাবো—কিন্তু ভালোবাসা শেখাতে পারবো না! সেটা তোমাকে নিজেকেই শিখতে হবে!

লীলা প্রথম প্রথম সত্যসুন্দরের কাছে আড়ষ্ট হয়ে থাকতো। অচেনা স্বামীকে চিনে নিতেই সময় লাগে। আর কিছুদিন আগেই যিনি ছিলেন তার অফিসের বড় কর্তা, হঠাৎ তাকে স্বামী হিসেবে পাওয়ায় মানিয়ে নিতে তো সময় লাগবেই।

সত্যসুন্দর লীলার ভয় ভাঙাবার জন্য কতরকম যে ছেলেমানুষী করেছেন, তার ঠিক নেই। তিনি তো শুধু নারীমাংস চান নি, চেয়েছিলেন একজন কোমল সঙ্গিনী। স্ত্রীর সামনে তিনি একেবারে শিশুর মতন হয়ে যেতেও রাজী। যুবক স্বামীদের মতন তিনি লীলাকে নিয়ে সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে বেরিয়েছেন। হানিমুন করতে গেছেন সমুদ্রের ধারে। মেয়েদের শাড়ি সম্পর্কে দুর্বলতার কথা জেনে তিনি লীলার শাড়ি গয়না বিষয়ে কোনোরকম ক্ষোভ রাখার সুযোগ রাখেন নি।

লীলাকে বাপের বাড়িতে যেতে না দিলেও তার সব আত্মীয়-

স্বজনদের দূরে সরিয়ে রাখা যায় নি। দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা দাবি করেও হঠাৎ হঠাৎ কেউ কেউ বাড়িতে এসে হাজির হয়। তিনি আপত্তি করতে পারেন না।

স্ত্রীকে চোখে চোখে রাখার বাতিকও তাঁর নেই। লীলাকে তিনি যথেচ্ছ স্বাধীনতা দিয়েছেন। সে তার বন্ধুদের সঙ্গে যখন খুশী দেখা করতে যেতে পারে। আত্মীয়-অনাত্মীয় যুবকদের সঙ্গে সিনেমায় যায়। তাঁর ছাত্র বা তরুণ সহকর্মীদের সঙ্গে তিনি সব সময়েই লীলার আলাপ করিয়ে দেন। তিনি জানেন, জল যেমন জলকে টানে, তেমনি যৌবনও যৌবনের দিকে আকর্ষিত হবেই। লীলার যাতে কোনো অভাব বোধ না থাকে, সেদিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি। লীলার প্রতি এতদিনে তাঁর একটা স্নেহমিশ্রিত মায়া জন্মে গেছে।

লীলাও অনেক বদলে গেছে এখন। স্বামীর প্রতি তার টান অসম্ভব তীব্র। অনেক সময় সে অভিমান করে, ঝগড়া করে, রাগের চোটে জিনিসপত্র ভাঙে—আবার এক সময় সত্যসুন্দরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, তুমি আমাকে বকো না কেন? তুমি এত ভালো কেন? আমি মোটেই তোমার যোগ্য নই।

সত্যসুন্দর হাসেন তখন। এই সুন্দর খেলনাটি তাঁকে বড় আনন্দ দেয়।

লীলা খুব একটা রূপসী নয়। গায়ের রং বেশ চাপা, নাক চোখেও খুব বিশেষত্ব নেই, কিন্তু তার স্বাস্থ্যটি চমৎকার এবং প্রাণ-চাঞ্চল্য আছে।

সত্যসুন্দর বছরের বেশীর ভাগ সময়ই কাটান দিল্লীতে। কলকাতা বা পশ্চিমবাংলা সম্পর্কে তার বিশেষ কোনো আলাদা টান নেই। তিনি এত বেশী সময় বাইরে বাইরে কাটিয়েছেন যে, যে-কোনো জায়গাতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তবে কলকাতায় তাঁর একটা বাড়ি আছে।

॥ ৪ ॥

নিউ আলিপুরে অল্প জমির ওপরে তিনতলা বাড়ি। এক তলাতে বসবার ঘর, রান্নাঘর এবং পিসীমার ঘর। সত্যসুন্দরের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সব মরে ঝরে গেছে, তিনি কারুর সম্পর্কে মাথাও ঘামান না—কিন্তু এই পিসীমাটিকে ফেলতে পারেন নি। ইনি খুঁজে খুঁজে দিল্লীতে গিয়েই সত্যসুন্দরকে খুঁজে বার করেছিলেন।

দোতলায় চারখানি ঘর, তার মধ্যে একটি লীলার, বাকিগুলো বইপত্রে ঠাসা। তিনতলায় একটি মাত্র ঘর, সেটা সত্যসুন্দরের নিজস্ব। অধিকাংশ সময় তিনি এই ঘরেই কাটান। তাঁর শোওয়ার খাটও এখানেই। প্রথমবার জার্মান রমণীকে বিয়ে করার পর থেকেই তিনি বুঝেছিলেন যে স্বামী-স্ত্রীর আলাদা শয়নকক্ষ থাকাই স্বাস্থ্যকর। প্রতিরাত্রে মিলন সম্ভব নয়, ইচ্ছেও করে না। একটু দূরত্ব থাকলে আকর্ষণ বাড়ে। স্বামী স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্ক তো কোনো নিয়মের মধ্যে পড়ে না। এটা আনন্দের ব্যাপার। আনন্দেরও বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত আছে। কখনো তিনি লীলাকে এ ঘরে ডেকে আনেন। কখনো লীলা নিজে থেকেই মাঝরাতে ওপরে উঠে এসে বলে, আজ আমার ভয় করছে।

বাইরের লোক খুব কমই একতলা ছেড়ে দোতলা-তিনতলায় ওঠে। গণ্যমান্য লোকেরা এলেও সত্যসুন্দর তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তার জন্য বেশী সময় খরচ করেন না। তবে লীলার বন্ধুবান্ধবরা তার সঙ্গে ওপরে এসেই কথা বলে। সত্যসুন্দরের প্রিয় শিষ্য বা ছাত্র বা ঘনিষ্ঠ সহকর্মী কেউ কেউ আসে তিনতলার ঘরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। যেমন আসে প্রবীর।

লীলা এলাহাবাদের মেয়ে। খুব অল্প বয়েসে একবার মাত্র কলকাতা এসেছিল। তখন কলকাতা ছিল তার চোখে একটা স্বপ্নের স্বর্গপুরী। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে দু'তিনবার কলকাতায় এসেও তার সেই ধারণা বদলায় নি। এই নোংরা, ভিড়ে ভর্তি শহরটাকে সে ভালোবেসে ফেললো। তা ছাড়া এখানে আছে তাদের নিজের বাড়ি। নিজের বাড়ির প্রতি মেয়েদের সাংঘাতিক টান থাকেই। নিজেদের এমন সুন্দর বাড়ি ফেলে হিল্লিদিল্লি থাকবার কোনো মানে হয়? সেইজন্যই একবার কলকাতায় এলে সে আর সহজে বাইরে যেতে চায় না।

বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে লীলার তেমন কোনো যোগাযোগ ছিল না। কলকাতায় আসবার পর সে পড়তে শুরু করেছে বাংলা বইপত্র। বাংলা সিনেমা ও নাটক—সবই তার দেখা চাই। সত্যসুন্দরের বাংলা ভাষা-প্রীতি থাকলেও তার রুচি বোধ তাঁকে এইসব সিনেমা ও থিয়েটার সম্পর্কে বিমুখ করে। তবু লীলার কোনো সঙ্গী না থাকলে তিনি অগত্যা যান তার সঙ্গে।

লীলা অবশ্য প্রায়ই সঙ্গী পেয়ে যায়। এখানে এসে সে তার যত রাজ্যের দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনদের খুঁজে বার করেছে। একজন দু'জনকে পাওয়া গেলেই সেই সূত্রে বাকিরাও আসে। লীলা তাদের বাড়িতে প্রায়ই ডেকে আনে, নেমন্তন্ন খাওয়ায়, হৈচৈ করে সিনেমায় যায়। সে এক সময় গরীব ছিল বলেই তার এখনকার ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী তুলে ধরতে চায় আত্মীয়দের কাছে।

সত্যসুন্দর যে এরকম ভিড় পছন্দ করেন না, তা লীলা জানে। তবু সে গ্রাহ্য করে নি। সত্যসুন্দরও শুধু মৃদু আপত্তি জানিয়েছেন, বাধা দেন নি তেমনভাবে।

সত্যসুন্দর ঠিকই করে রেখেছেন, এই কমিশনের কাজ শেষ হয়ে গেলে তিনি আবার কলকাতার পাট তুলে দেবেন। লীলাকে নিয়ে

তিনি বেরিয়ে পড়বেন আবার, হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে বছর দু'য়েক কাটাবেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাধুরা যে হিমালয়ে এসে আশ্রয় নেয়, তাদের মধ্যে প্রাদেশিকতা আছে কিনা—সেটা অনুসন্ধান করে দেখার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ আছে। এদের যোগাযোগের মাধ্যম কিভাবে গড়ে ওঠে, এদের খাদ্যাভ্যাস কিভাবে বদলায়, তা জানা দরকার। এই বিষয়ে বিশেষ কোনো কাজই হয় নি।

প্রত্যেকদিন অফিস থেকে সোজা বাড়ি ফিরে আসেন সত্যসুন্দর। সরকার থেকে তাঁকে একটা গাড়ি দেওয়া হয়েছে। গাড়িখানা চব্বিশ ঘণ্টা ব্যবহারের জন্য।

বাড়ি ফিরে তিনি একতলায় তাঁর পিসীমার খবর নেন একবার। বৃদ্ধার চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তাই তিনি সত্যসুন্দরের গায়ে হাত বুলিয়ে কথা বলেন। সেই লোলচর্ম বৃদ্ধার হাতের স্পর্শে বহু দিনের পুরোনো স্নেহ লেগে আছে। তিনি হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, হ্যাঁ রে রাজু, শরীরের যত্ন নিস তো ঠিক মতন? বাবাঃ যা মাথার কাজ করতে হয় তোকে। বৌমাকে বলিস, যেন রোজ থানকুনি পাতার রস করে দেয় তোকে।

লীলা এই পিসীকে দেখতে পারে না; কোনো খোঁজখবরও নেয় না। পিসী কিন্তু কোনোদিনই লীলা সম্পর্কে একটি অভিযোগও করেন নি।

সত্যসুন্দর দোতলায় উঠে এসে উঁকি মারেন লীলার ঘরে। সত্যসুন্দর অফিস থেকে ফেরার আগেই লীলা গা ধুয়ে সেজেগুজে থাকে। ভুরুতে কাজল, শাড়ির সঙ্গে রং মেলানো টিপ আঁকে কপালে।

স্বামীকে দেখে লীলা জানলার ধারের চেয়ার ছেড়ে উঠে আসে। তাদের জানলা দিয়ে অদূরে একটা ফুটবল মাঠ দেখা যায়, সেখানে

গায়ে ধুলো-কাদা মাখা যুবকেরা ফুটবল নিয়ে লড়াই করে প্রত্যেক বিকেলে। রোজ সেই খেলা দেখতে দেখতে লীলা ফুটবল খেলার ভক্ত হয়ে গেছে রীতিমতন।

সত্যসুন্দর স্ত্রীর গালে একটা টোকা দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, কি লীলাময়ী, আজ কি প্রোগ্রাম?

লীলা প্রত্যেকদিন নতুন নতুন প্রোগ্রাম বানায়। সন্ধ্যেবেলা সে বাইরে বেরুবেই। বিকেলবেলা সে ঘরের মধ্যে খাঁচায় ভরা একটা সুন্দর পাখির মতন ছটফট করে। চলতি সিনেমা-থিয়েটার নিঃশেষ হয়ে গেলেও সে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে দেখে গানের জলসা, ম্যাজিক শো ইত্যাদি যা হোক কিছু খুঁজে বার করে। এসবের জন্য সে অন্য সঙ্গী খুঁজে নেয়। এসব কিছু না থাকলে সে সত্যসুন্দরকে নিয়েই বেড়াতে বেরোয়।

গঙ্গার ধারে কিংবা বালীগঞ্জের লেকে যেতে সত্যসুন্দরের মন্দ লাগে না। টাটকা হাওয়ার একটা আলাদা স্বাদ আছেই। ওই সব জায়গায় বহু অল্প বয়সী যুবক-যুবতীদের দেখতে পাওয়া যায়, মনে হয় কত লঘু তাদের জীবন। ওই রকম বয়েসে সত্যসুন্দর একদিনের জন্যও বিশ্রাম পান নি।

লীলা যেদিন অন্যদের সঙ্গে সিনেমা-থিয়েটারে যায়, সেদিন তিনি উঠে আসেন তিনতলায় তাঁর নিজের ঘরে। তাঁর ঘরের সঙ্গেই বাথরুম আছে। স্নান করার আগে তিনি কিছুক্ষণ ব্যায়াম করে নেন। সকালে সন্ধ্যায় ব্যায়াম করা তাঁর বহুদিনের অভ্যেস। একমাত্র চোখ ছাড়া শরীরের আর কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তাঁর কোনো খুঁত নেই।

স্নান সেরে জামা-কাপড় বদলে তিনি আরাম কেদারায় বসেন। এখানে জানলা দিয়ে বহুদূর দেখা যায়। খুব একটা সুন্দর দৃশ্য কিছু নয়। বড় বড় ঝকঝকে নতুন বাড়ির ধার ঘেঁষেই পুরোনো বস্তি। রাস্তায় যখন তখন ট্র্যাফিক জ্যাম। বই খুলে বসলেই সত্যসুন্দরের

ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্বচ্ছন্দে কেটে যায়। মাঝে মাঝে তিনি নিজের মনে বিড়বিড় করেন। রাত দশটার সময় লীলা নিজে তাকে ডাকতে আসে খাবার খেতে যাওয়ার জন্য।

সেদিন সত্যসুন্দর বাড়ি ফিরে দেখলেন, লীলা একেবারে সেজেগুজে তৈরি হয়েই বসে আছে। থিয়েটারে যাবেই।

সত্যসুন্দর একটু ক্লান্ত বোধ করছিলেন। থিয়েটারে যাবার ব্যাপারে উৎসাহ পাচ্ছিলেন না। এদেশের কোনো থিয়েটার হলেরই অ্যাকাউসটিকস্ ভালো নয়। অভিনেতা অভিনেত্রীদের বড্ড চেঁচিয়ে কথা বলতে হয়। বাস্তবসম্মত অভিনয়ের ধারা প্রবর্তন করেও এই কৃত্রিমতাটা রয়ে গেছে। এখানে গোপন কথা কেউ ফিসফাস করে বলে না, দুঃখের সময়ও গলা ধরে যায় না।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আজ থিয়েটারে যেতেই হবে!

লীলা : আমি তৈরি হয়ে বসে আছি।

সত্যসুন্দর : তুমি যদি আর কারোর সঙ্গে যেতে।

লীলা : আমি অন্যদের সঙ্গে সিনেমা থিয়েটার দেখতে যাবো কেন রোজ রোজ? আমার বুঝি তোমার সঙ্গে যেতে ইচ্ছে করে না!

সত্যসুন্দর : সত্যি ইচ্ছে করে?

লীলা : তুমি এত কিছু জানো, এত কিছু বোঝো, আর আমার মনের কথাটা বুঝতে পারো না?

সত্যসুন্দর লীলার গালে একটা আদরের টোকা মেরে বললেন, চলো তাহলে!

থিয়েটারে গিয়ে সত্যসুন্দর মোটামুটি উপভোগই করলেন। যতটা খারাপ ভেবেছিলেন, ততটা খারাপ নয়। নাটক দেখতে দেখতে লীলাকে তিনি আইসক্রিম খাওয়ালেন, নিজেও খেলেন একটা। তাঁর মনের ক্লান্ত ভাবটা কেটে গেছে।

শো ভাঙবার পর প্রবীরের সঙ্গে দেখা। সে-ও নাটকটি দেখতে

এসেছিল। প্রবীরকে দেখে সত্যসুন্দর একটু বিস্মিত হলেন। প্রবীর একা এসেছে। একা একা কোনো যুবক কি থিয়েটার-বাইস্কোপ দেখতে যায়? কোনো একটা মেয়ে-টেয়ে জোটাতে পারে নি? আজাকলকার ছেলেরা কি!

তারপর মনে হলো, বোধহয় প্রবীরের সঙ্গে কোনো মেয়ে ছিল, চট্ করে প্রবীর তাকে চলে যেতে বলেছে। মাস্টার মশাইয়ের সামনে বান্ধবীকে দেখাতে লজ্জা পায়। সত্যসুন্দর মনে মনে হাসলেন। নারী-ঘটিত ব্যাপার সম্পর্কে মধ্যবিত্ত বাঙালীর এই সব সংস্কার যে কবে দূর হবে!

প্রবীর বললো, স্যার, আপনারা যে আজ আসবেন, জানতুম না তো! আপনারা কি টিকিট কেটে এসেছেন?

সত্যসুন্দর বললেন, টিকিট না কেটেও নাটক দেখার অন্য কোনো উপায় আছে নাকি?

প্রবীর বললেন, আমার সঙ্গে এদের খুব চেনা আছে। আমি আগে জানলে আপনাদের জন্য ফ্রি পাস যোগাড় করতে পারতাম। এরা খুব খুশী হয়েই দিত, আপনার নাম শুনলে—

সত্যসুন্দর বললেন, আমি ফ্রি পাসে কোথাও যাই না। টিকিট কেটে এদের পৃষ্ঠপোষকতা করাই তো উচিত!

প্রবীর একটু চুপসে গেলেও আবার নিজেকে সামলে নিল। লীলার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, বৌদি, আপনার কেমন লাগলো নাটকটা?

প্রবীর এমনভাবে জিজ্ঞেস করলে, যেন সে-ই এই নাটকের নাট্যকার কিংবা পরিচালক। লীলা যখন বললো, 'খুব ভালো', তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার মুখ।

সত্যসুন্দর প্রবীরকেও তুলে নিলেন নিজের গাড়িতে। জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কোথায় নামাবো?

প্রবীর বিনীতভাবে বললো, স্যার, একটা কথা বলবো? আপনারা কি এখন সোজা বাড়ি যাচ্ছেন?

—কেন বলো তো?

—যদি বাইরে কোথাও থাই, আমরা সবাই মিলে—মানে আমি আপনাদের আজ খাওয়াতে চাই।

—তুমি আমাদের খাওয়াবে?

—অনেকদিন থেকেই আমার ইচ্ছে, মানে, চাকরি পাবার পর।

—বেশ তো ভালো কথা।

—বৌদি, আপনার আপত্তি নেই তো?

লীলা বললো, একটুও না। আমারও এক্ষুনি বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছিল না—

সকলে গিয়ে উঠলেন একটা হোটেলে। সত্যসুন্দর প্রচুর মোগলাই খানা অর্ডার দিলেন। তিনি নিজে একাই খেয়ে ফেললেন ওদের দু'জনের সমান। তারপর আবার অর্ডার দিলেন। আজ যেন তাঁকে খাওয়ার নেশায় পেয়েছে। নতুন নতুন প্লেট এনে খানিকটা চেখেই সরিয়ে রাখছেন পাশে।

এক সময় খাওয়া শেষ হলো। তারপর বিল এলো। রুমালে হাত মুছে সত্যসুন্দর টাকা বার করতে লাগলেন পকেট থেকে।

প্রবীর বললো. স্যার, আপনি টাকা বার করছেন কেন? আজ আমার দেওয়ার কথা।

সত্যসুন্দর বললেন, ঠিক আছে, তুমিই দাও!

বিল যা উঠেছে, প্রবীরের কাছে তার চেয়ে কিছু টাকা কম আছে। সে মহা অস্বস্তিতে পড়ে গেল। উদ্‌ভ্রান্ত চোখে তাকাতে লাগলো লীলা ও সত্যসুন্দরের দিকে। সত্যসুন্দর মিটিমিটি হাসছেন।

লজ্জার মাথা খেয়ে শেষ পর্যন্ত প্রবীর বললো, স্যার, আপনার কাছ থেকে দশটা টাকা ধার নিতে হবে।

সত্যসুন্দর সুমিষ্ট স্বরে বললেন, আজ থাক, তুমি আর একদিন বিল দিও। আজ আমিই মিটিয়ে দিচ্ছি।

বেচারা প্রবীর শখ করে একদিন গুরু ও গুরুপত্নীকে খাওয়াতে চেয়েছিল। কিন্তু সত্যসুন্দর কেন যে আজ এত বেশী খাবার খেয়েও অনেক খাবার ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করে প্রবীরকে বিব্রত করে তুললেন, তা বোঝা যায় না। বোধহয় মনীষীদের খেয়াল।

এক সময় দরিদ্র ছিলেন বলেই বোধহয় এখন সত্যসুন্দর যখন তখন দরাজভাবে টাকা-পয়সা খরচ করেন। তাঁর সামনে অন্য কারুর টাকা খরচ করা তিনি সহ্য করতে পারেন না।

বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হলো। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় লীলা গুনগুন করে গান ধরেছে। তার মন আজ খুব প্রফুল্ল। দোতলায় এসে নিজের ঘরে ঢুকেই সে জড়িয়ে ধরলো সত্যসুন্দরকে। কোনো কথা না বলে স্বামীর ওষ্ঠে নিজের ওষ্ঠ ডোবালো। তার স্পর্শে এখন বিশেষ রকম উষ্ণতা।

সত্যসুন্দর মনে মনে একটু অবাক হলেন। লীলা কখনো নিজের থেকে এরকমভাবে আদর করে না। যদিও ওই জিনিসটা পাবার খুব সাধ তাঁর। কিন্তু মুখ ফুটে কখনো বলেন নি।

চুম্বন শেষ করার পর তিনি লীলাকে প্রশ্ন করলেন, এ কি, আজ এত উচ্ছ্বাস যে!

লীলা : তোমাকে যতই দেখছি, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি।

সত্যসুন্দর : অবাক হবার মতন আবার কি করলাম?

লীলা : তোমার মতন পুরুষমানুষ আর একজনও নেই। এত মানুষ তো দেখি, কিন্তু তুমি সকলের চেয়ে বড়। সব দিক থেকে, সব রকমভাবে বড়!

সত্যসুন্দর খুশী হলেন এবং সেই খুশী তাঁর মুখে ফুটে উঠলো। নারীর প্রশংসা সব সময়েই তাঁর প্রাণে উৎসাহের সঞ্চার করে। সেই প্রশংসা মিথ্যা স্তুতি হলেও ক্ষতি নেই।

তিনি ঠিক করলেন, আজ আর তিনতলায় উঠবেন না। লীলার সঙ্গে এক শয্যায় রাত কাটাবেন।

এরপর কয়েকটা দিন সত্যসুন্দর বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। উপরাষ্ট্রপতি এসেছেন কলকাতায়। উপরাষ্ট্রপতি নিজে বেশ বিদ্বান এবং ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে খুব আগ্রহী। প্রতিদিন অপরাহ্নে তিনি সত্যসুন্দরের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বসেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে যায়।

এই ক'দিন সত্যসুন্দরের বাড়ি ফেরার সময়ের কোনো ঠিক রইলো না। লীলাকে তিনি সে কথা জানিয়ে রেখেছেন। লীলাকে এ কথাও বলে দিয়েছেন যে তার সিনেমা থিয়েটার দেখার ইচ্ছে হলে সে যেন অবশ্য যায়। সত্যসুন্দরের গাড়ি রাখা থাকবে তার জন্য। যে-কোনো বন্ধু বান্ধবীকেও সে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে। এক একদিন সত্যসুন্দর বাড়িতে এসে দেখেন, লীলা তখনও ফেরে নি। সত্যসুন্দর নিজের খাবারটা খেয়ে নিয়ে চলে যান ওপরের ঘরে। একটা বই খুলে পড়তে পড়তে হয়তো ইজি চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়েন। তবে, লীলা যখনই ফিরুক, একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে যায়। ইজি চেয়ারে সত্যসুন্দরকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখলে মৃদু বকুনি দিয়ে জাগিয়ে তোলে, বিছানায় সত্যসুন্দরের মাথার কাছে একটুক্ষণ বসে এলোমেলো ছেলেমানুষীতে ভরা সুন্দর গল্প করে। এলাহাবাদের সেই ভীতু, লাজুক মেয়েটিকে এখন আর চেনাই যায় না। সেই সবিতা আর নেই, এখন সে সত্যই লীলাময়ী।

একদিন রাত ন'টা আন্দাজ সত্যসুন্দরের মাথার মধ্যে হঠাৎ চিন চিন করে উঠলো। নিজের ঘরেই তিনি বই নিয়ে বসেছিলেন।

এই প্রকার অনুভূতিতে একটু বিরক্ত হলেন। ক'দিন ধরেই মাথার মধ্যে এরকম চিনচিন করে উঠছে মাঝে মাঝে। এ ছাড়া সর্বক্ষণ একটা মাথা ধরার ভাব। সারা জীবনে সত্যসুন্দর অসুখ-টসুকে এত কম ভুগেছেন যে, সামান্য কিছু হলেই তিনি নিজের ওপর রেগে যান। যেন এটা তার অক্ষমতা।

চোখের জন্য মাথা ধরার ব্যাপারটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। সত্যসুন্দর ভাবলেন চশমার পাওয়ার আবার বাড়াতে হবে। এই এক ঝামেলা। যাই হোক, আপাতত মাথা-ধরার একটা কিছু ওষুধ এখন খাওয়া দরকার।

সত্যসুন্দর নিজের ঘরে ওষুধ-পত্তর কিছুই রাখেন না। লীলার ঘরে পাওয়া যেতে পারে। ন'টা বেজে গেছে, লীলা এতক্ষণে সিনেমা দেখে ফিরেছে কি!

সত্যসুন্দর নেমে এলেন নিচে, লীলার ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। স্বামী কখনও স্ত্রীর ঘরে ঢোকার আগে শব্দ করে জানান দেবার প্রয়োজন মনে করে না।

সত্যসুন্দর দরজা ঠেলে এক পা বাড়িয়ে থেমে গেলেন।

লীলার বুক থেকে শাড়ির আঁচল খসে গেছে। তার নগ্ন কোমরে প্রবীরের হাত। লীলার ওষ্ঠাধর স্ফুরিত, চোখ জ্বলজ্বলে, সে প্রবীরের বুকে মাথা হেলান দিয়ে আছে। তারপর বোঝা যায় সে কাঁদছে একটু একটু। প্রবীরের বুকে ছোট ছোট কিল মেরে সে বলছে, কেন? কেন? কেন?

সত্যসুন্দর স্থাণু হয়ে গেলেন। তার গলা দিয়ে একটু স্বরও বেরুলো না। ওরা দুজনে তাঁর দিকে ফিরে তাকাবার পরও তিনি সরে যেতে পারলেন না। তার যেরকম শারীরিক শক্তি তাতে ক্রোধের বসে তিনি এই ছেলেমেয়ে দুটিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারতেন। তিনি কিছুই করলেন না।

বরং তাঁর মনে হলো, গলার কাছে তাঁর কোটের বোতামটা এক্ষুনি না খুলে ফেললে তাঁর দম বন্ধ হয়ে যাবে। বোতাম খোলার জন্য তিনি হাত তুলতে চাইলেন, পারলেন না। তিনি অসহায়ভাবে ঝুপ করে পড়ে গেলেন মাটিতে।

॥ ৫ ॥

একজন ডাক্তার এসে আরও দু'জন ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন। তিনজন ডাক্তার শলাপরামর্শ করলেন, অনেকক্ষণ ধরে। সত্যসুন্দরকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যাপারে ডাক্তারদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। একজন ডাক্তারের মতে সত্যসুন্দরকে তাঁর নিজের বিছানায় শান্তিতে মরতে দেওয়াই ভালো। আর একজন ডাক্তারের মতে, হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথেই সত্যসুন্দরের মৃত্যু হলে দায়ী কে হবে? তৃতীয়জন জেদ করতে লাগলেন হাসপাতালে পাঠাবার জন্য।

জ্যান্ত অবস্থাতেই পি. জি. হাসপাতালে পৌঁছোলেন সত্যসুন্দর। সবাইকে অবাক করে তারপরেও দিনের পর দিন বেঁচে রইলেন।

সত্যসুন্দরের সর্বাঙ্গে পক্ষাঘাত হয়ে গেছে। বাকশক্তিও নেই। কিন্তু মস্তিষ্ক ঠিক আছে। তিনি তাকিয়ে তাকিয়ে সব কিছু দেখেন, সব বুঝতে পারেন কিন্তু কোনো মতামত প্রকাশ করতে পারেন না। সামান্য অঙ্গুলি হেলনের ক্ষমতাও তাঁর নেই।

খবরের কাগজে প্রথম দিনই সত্যসুন্দরের অসুস্থতার খবর ছাপা হয়েছিল। সারা দেশ থেকে উদ্বিগ্ন টেলিগ্রাম আসছে। কেন্দ্রের কয়েকজন মন্ত্রীও সত্যসুন্দরের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিচ্ছেন।

খবর পেয়েই লীলার বাবা, মা ছুটে এসেছে। সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক। লীলা অসম্ভব কান্নাকাটি করেছে প্রথম কয়েকদিন।

কান্নার সময় এমন ছটফট করেছে যে তাকে ধরেই রাখা যায় না। লীলার বাবার একেবারে দিশেহারা অবস্থা। এতবড় একটা ঘটনার মাঝখানে পড়ে কোনো রকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাই তাঁর নেই। এই সময় প্রবীরই গোটা পরিবারটার আশ্রয়স্থল হয়ে উঠলো। সত্যসুন্দরের চিকিৎসার ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ করে সব কিছু সে নিজের দায়িত্ব নিয়ে করতে লাগলো। এবং সে দৃঢ়ভাবে বলতে লাগলো, স্যার বেঁচে উঠবেনই। এরকম ভাবে স্যারের মৃত্যু হতে পারে না।

বিকেলবেলা হাসপাতালে সত্যসুন্দরের খাটের পাশে রীতিমত একটা ভিড় জমে যায়। অন্যান্য রুগীদের যারা দেখতে আসে, তারাও একবার এসে সত্যসুন্দরের দিকে উঁকি মেরে যায়। দর্শনীয় ব্যাপারই বটে। সত্যসুন্দর রীতিমতন সুপুরুষ এবং বিশাল শরীর। অত বড় শরীরটা নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে খাটের ওপর। ঠিক যেন মহাকাব্যের কোনো নায়কের পতন দৃশ্য।

দশদিন পর দেখা গেল, সত্যসুন্দর সামান্য ঠোঁট নাড়তে পারছেন। তার অর্থ কিছুই বোঝা যায় না। তবু নড়ছে যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তখন সকলেরই আশা হলো, সত্যসুন্দর হয়তো আস্তে আস্তে আবার সব ক্ষমতা ফিরে পাবেন। এরকম হয়। মানসিক জোর থাকলে এটা অসম্ভব কিছু নয়। হঠাৎ দেখা যাবে রোগী একেবারে সুস্থ হয়ে গেছে। আর সত্যসুন্দরের মনের জোরের কথা তো সুবিদিত।

ঠোঁট নড়ে, আর চোখের পাতা পড়ে। মানুষের চোখেরও তো একটা ভাষা থাকে। সত্যসুন্দর নিশ্চয়ই চোখ দিয়ে কিছু বলতে চান! কিন্তু কেউ সে কথা বুঝতে পারে না।

লীলা দু'বেলা হাসপাতালে আসে। এক সময় তার জন্য ঘর খালি করে দেওয়া হয়, অন্যরা বাইরে চলে যায়, লীলা একলা থাকে স্বামীর কাছে। সত্যসুন্দরের বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে লীলা বলে,

ওগো, তুমি আর কথা বলবে না ? আমার ওপর রাগ করেছো ? আমার ওপর রাগ করে আর কতদিন থাকবে ? অন্তত বকুনি দাও একবার !

সত্যসুন্দরের চোখের-পাতা তখন স্থির হয়ে থাকে।

সত্যসুন্দর কানে কিছু শুনতে পাচ্ছেন কিনা, তাও বোঝা যায় না। অনেক সময় একলা একলা থাকলেও তার ঠোঁট নড়ে। আজ কি তিনি নিজের সঙ্গে কথা বলতে চান ? আবার অন্যরা যখন কথা বলে, তখন সত্যসুন্দরের ঠোঁট নড়লে বোঝা যেত অন্তত যে তিনি কিছু একটা উত্তর দিতে চাইছেন। সব সময় তাও নড়ে না।

এত রাশভারী মানুষটাকে এমন নির্বাক অবস্থায় দেখলেও কষ্ট হয়।

এর পর কয়েক দিনের মধ্যে সত্যসুন্দরের আর কোনো রকম পরিবর্তন হলো না। বড় বড় ডাক্তাররা মিলে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। দেখা গেল, ওষুধে আর কোনোরকম কাজ হচ্ছে না। এখন শুধু অপেক্ষা করা। ওষুধ-পত্রের ক্ষমতা ছাড়িয়েও অনেক সময় অনেক কিছু ঘটে যায়।

হাসপাতালের পরিবেশ রোগীর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী নয় বলে একমাস বাদে সত্যসুন্দরকে বাড়িতে নিয়ে আসা হলো। স্ট্রেচার বাহকরা তাকে নিয়ে এলো দোতলায় লীলার ঘরে। শোওয়ানো হলো লীলার খাটে।

লীলা আর একখানা ঘরের বইপত্র সরিয়ে সেখানাকেও বাসযোগ্য করে তুললো। একজন নার্স ঠিক করা হয়েছে। তবে আকস্মিক বিপদের আশংকা নেই বলে নার্স রাত্তিরে থাকবে না, শুধু দিনের বেলা।

সত্যসুন্দর অধিকাংশ সময়েই চোখ বুজে থাকেন। কখন ঘুমিয়ে আছেন, আর কখন জেগে, তা বোঝা যায় না। নার্স তাকে ফিডিং

কাপে করে খাইয়ে যায়, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে সত্যসুন্দরের গা মুছিয়ে দেয়। সত্যসুন্দর তখনও চোখ বুজে থাকেন।

—স্যার, স্যার!

কুণ্ঠিত ডাক শুনে সত্যসুন্দর চোখ মেলে তাকালেন। প্রবীর তাঁর মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

—স্যার, আপনাকে কিছু বলার মুখ নেই আমার। তবু যদি আমাকে একটু সুযোগ দেন, যদি আমি বুঝিয়ে বলি।

সত্যসুন্দর নির্বাক, নিস্পন্দ, স্থির দৃষ্টি।

সেই রাত্রির পর অনেকগুলো দিন কেটে গেছে। প্রবীর এর মধ্যে আর সত্যসুন্দরের সামনা-সামনি আসেনি একা। ভিড়ের মধ্যে অনেকবার উঁকি দিয়েছে বটে, কিন্তু একলা তাঁর মুখোমুখি আসতে ভয় পেয়েছে বোধ হয়।

আজও কি সে একা এসেছে না লীলা কোথাও লুকিয়ে আছে? হয়তো দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে লীলা তাকে প্রেরণা দিচ্ছে।

—স্যার, আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?

সত্যসুন্দর চোখের-পাতা পিটপিট করলেন। প্রবীরের চেহারাটা সুন্দর, সে কথাও বলছে থিয়েটারি ভঙ্গিতে। বিছানার ওপর মুখ ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়েছে।

বোকা ছেলেটা তাঁকে একটু পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিচ্ছে না কেন? চিৎ হয়ে শুয়ে সব সময় ঘরের কাজ দেখতে কারুর ভালো লাগে? সত্যসুন্দর পাশ ফিরে শুয়ে থাকলে প্রবীরেরও অত মুখ ঝুঁকিয়ে কথা বলতে হতো না। অবশ্য পাশ ফিরে শুলে সত্যসুন্দর দেখে ফেলতেন লীলা কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা।

—স্যার, আপনি জানেন, আপনাকে আমি কতখানি শ্রদ্ধা করি। আপনি দয়া না করলে আমি জীবনে কিছুই করতে পারতাম না।

আগে প্রবীর সত্যসুন্দরের কাছে এ সব কথা বলতে সাহস

পেত না। এ সব কৃতজ্ঞতা-টৃতজ্ঞতা সত্যসুন্দর একদম পছন্দ করেন না।

—স্যার, আমি, মানে আমরা কোনো অপরাধ করেছি। আপনি হয়তো ভুল বুঝেছেন—

সত্যসুন্দর ভাবলেন, এখন রাত কটা হবে? দশটা? সাড়ে দশটা? নার্স বাড়ি যাবার আগে তাঁকে রাত্রির খাবার খাইয়ে গেছে। সে তো যায় ন'টার সময়। অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে। প্রবীর এখনো যায়নি। ও কি রাত্তিরে এখানেই থাকে?

প্রবীরের মুখখানা ভীতিবিহ্বল। অশক্ত, অসহায় সত্যসুন্দরকেও সে ভয় পাচ্ছে।

প্রবীর বললে, স্যার, আপনি আমাকে কি ভাবছেন, জানি না। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলছি—

সত্যসুন্দরের যদি হাসার ক্ষমতা থাকতো তিনি হাসতেন এই সময়। ভয় পেয়ে ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাই ভুলে গেছে সে, সত্যসুন্দর সারাজীবনে কখনো ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন নি। তাই ঈশ্বরের দিব্যির কোনো মূল্যই নেই তাঁর কাছে।

—লীলাদি আমার মাসীমার মেয়ে। আপন মাসী না হলেও ওকে আমি ঠিক নিজের দিদির মতনই দেখি।

সত্যসুন্দর ভাবলেন, মানুষ এতো নির্বোধ হয় কি করে? তাঁর অসুখের আগেও প্রবীর লীলাকে বৌদি বলে ডাকতো! আজ হঠাৎ দিদি বলতে শুরু করেছে। ভেবেছে বোধহয়, সত্যসুন্দরের এখন মস্তিষ্ক বিকার—তাই যা খুশী বলে বোঝানো যাবে।

—ওঁর হঠাৎ খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সেদিনই চিঠি পেয়েছিলেন যে ওর বাবার শরীর খারাপ, খুব কান্নাকাটি করছিলেন।

আঃ, এইসব আজে বাজে কথা বলে কেন যে সময় নষ্ট করছে।

এর চেয়ে অনেক দরকারী কথা জানার দরকার ছিল প্রবীরের কাছে। কমিশনের কাজ কি বন্ধ হয়ে গেছে? কিংবা নতুন চেয়ারম্যান ঠিক করেছে ওরা। ভাষা কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে সত্যসুন্দরের নাম পার্লামেন্টে ঘোষণা করা হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর আগেই তাঁকে সরাতে গেলে আইন ঘটিত কিছু গোলমাল দেখা দেবে বোধহয়। সত্যসুন্দরের ক্ষমতা থাকলে তিনি পদত্যাগ পত্র অবশ্যই লিখে দিতেন।

এইসব কথা কিছুই বলে না কেন এরা? সন্ধ্যেবেলা অনেক গণ্যমান্য লোক এসেছিলেন তাঁকে দেখতে। তার মধ্যে একজন আবার মন্ত্রী। নানারকম মন্তব্য করলেন সকলে, কিন্তু কমিশনের কাজের কথা কেউ উচ্চারণ করেন নি। ভেবেছিলেন বোধহয়, এই সময় অফিসের কাজকর্মের কথা শুনলে সত্যসুন্দরের মাথার ওপরে আরও চাপ পড়বে। বাঞ্চ অফ ফুলস! বিরক্তিতে সত্যসুন্দর চোখ বন্ধ করেছিলেন তখন।

এখন বুঝতে পারছেন, প্রবীর কেন এত রাত্তির পর্যন্ত এখানে আছে। অন্য সময় বহু লোকজনের ভিড়, প্রবীর একটু নিরালা খুঁজছিল। সে তার মনের ভার লাঘব করতে চায়।

প্রবীর বললো, আমার মনে কোনো পাপ ছিল না, আপনি বিশ্বাস করুন। লীলাদিও আপনাকে এত বেশী ভক্তি করেন—

এরা কি সত্যসুন্দরকে ঈর্ষাকাতর সাধারণ মানুষ মনে করে? তাঁর স্ত্রী অন্য কার বুকে মাথা রেখেছে কিংবা চুম্বন করেছে, তাতেই তিনি এ রকম হয়ে পড়বেন? এমন কি ওরা এক বিছানায় শুলেই বা কি যেত আসতো? তিনি জানেন, অমৃত কখনো উচ্ছিষ্ট হয় না। আনন্দ মানুষকে খুঁজে নিতে হয়। সাধারণ মানুষেরা নারী সম্পর্কে ঈর্ষা করে আনন্দ পায়। সত্যসুন্দর অসাধারণ।

তা ছাড়া তিনি কি আগেই লক্ষ্য করেন নি লীলা আর প্রবীরের ঘনিষ্ঠতা? ঐ যে এক সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়া, পরস্পরের

দিকে গাঢ় চোখে তাকানো, নানা ছুতোয় হাত ছোঁওয়া—এর মানে কি তিনি বোঝেন না ? তিনি সজ্ঞানে এর প্রশ্রয় দিয়েছেন।

লীলাকে আনন্দ দেবার জন্য তিনি কোনো ত্রুটি রাখেন নি। নানারকম অলংকার সংগ্রহের মতন সে যদি দু-একটি প্রেমিকও জুটিয়ে নেয়, তাতে আপত্তি করার তো কিছু নেই। তিনি তাঁর নিজের প্রাপ্য ঠিকই পেয়েছেন। লীলার কাছ থেকে তিনি আনন্দ পেয়েছেন। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই আসে না এখানে।

লীলাকে তিনি ওর পরিবার থেকে ছিন্ন করে এনে নিজের হাতে নতুন করে গড়েছেন। আগে লীলা একটাও ইংরেজি বাক্য শুদ্ধ করে বলতে পারতো না। বাংলা জ্ঞানও ছিল যৎ সামান্য। যে-কোনো কথা বলতে গেলেই লজ্জায় মুখ নীচু করে থাকতো।

সেই লীলা এখন অনেক স্মার্ট ও স্বাভাবিক হয়েছে। বই-পত্র সম্পর্কে একটা আগ্রহ জেগেছে। তার চেহারাও হয়েছে অনেক সুন্দর। সে হাসলেই তাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়।

সত্যসুন্দরের হঠাৎ মনে পড়লো একটা রাতের কথা। সেবার লীলাকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন নালন্দায়। উঠেছিলেন রাজগীরের টুরিস্ট লজে। দিনের বেলা একবার নালন্দা ঘুরে আসার পরেও রাত্তিরে আবার গিয়েছিলেন সেখানে। দারুণ জ্যোৎস্নার রাত, সেই ধ্বংস স্তূপের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে কি রকম যেন একটা অতি-প্রাকৃত অনুভূতি হয়। মনে হয়, কোনো কিছুই হারায়নি। নালন্দার ছাত্রাবাসগুলিতে যেন এখনো রয়েছে দেশ-বিদেশের ছাত্র, প্রদীপের আলোয় পুঁথি পাঠ করছেন প্রখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিতরা।

সত্যসুন্দর নিবিষ্টভাবে নালন্দার পুরোনো ইতিহাস নিয়ে চিন্তা করছিলেন, হঠাৎ লীলা একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে তাল সামলাবার জন্য সত্যসুন্দরের হাতটা চেপে ধরলেন, সত্যসুন্দর চমকে উঠলেন। লীলার হাতটা কী গরম !

তারপর লীলার মুখের দিকে তাকালেন। জ্যোৎস্নায় ধোওয়া মুখখানা কী অদ্ভুত সুন্দর আর জীবন্ত। সত্যসুন্দরের বুকটা যেন জুড়িয়ে গেল। তিনি শুধু ইতিহাস আর ভাষাতত্ত্ব নিয়েই কাটালেন সারাদিন। অথচ এই জ্যোৎস্নালোকে এই সুন্দর রমণী মূর্তি যেন সবকিছু তুচ্ছ করে দেয়। নিছক সৌন্দর্যেরও একটা আলাদা দাম আছে।

ডাক্তারদের বা অন্যদের তো কেউ কিছু বলেনি। প্রবীর আর লীলাই শুধু ভাবছে তাদের ঐ ঘনিষ্ঠ দৃশ্যটা দেখে ফেলার জন্যই তিনি এরকম অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর ক্ষমতা থাকলে তিনি চিৎকার করে এর প্রতিবাদ করতেন। এ হতেই পারে না। তাঁর অসুখের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই। তাঁর মাথার মধ্যে যে চিনচিনে ব্যথাটা ছিল, সেটা আসলে করোনারি অ্যাটাকের পূর্ব লক্ষণ, ব্যাপারটা কাকতালীয়বৎ এক সঙ্গে ঘটেছে। এই বেচারা দু'জনকে মানসিক গ্লানি থেকে তিনি মুক্তি দিতে চান।

আসলে তিনি তাঁর শরীরের কাছে হেরে গেছেন। মনের জোর দিয়ে তিনি সব কিছু জয় করতে পারতেন, শুধু এই অসুখটাকে থামাতে পারলেন না।

কার পায়ের শব্দ পেলেন। আর একজন কে দাঁড়ালো তাঁর মাথার কাছে। ঘাড় ঘোরাতে পারছেন না বলে দেখতে পাবেন না। কিন্তু তাঁর শ্রবণ শক্তি এখন অসম্ভব বেড়ে গেছে। অনুভূতিও তীক্ষ্ণ হয়েছে। তিনি বুঝতে পারলেন, লীলা এসেছে এবং প্রবীরের সঙ্গে চোখে চোখে কিছু কথা বলে নিচ্ছে।

লীলা এগিয়ে এসে সত্যসুন্দরের পাশে বসে পড়লো। ছলছলে চোখ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আমায় চিনতে পারছো।

সত্যসুন্দর সামান্য ঠোঁট নাড়লেন।

লীলা ব্যগ্রভাবে মুখ ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি ? কি বলছো ?

প্রবীরও কাছে এগিয়ে এসেছে।

ওরা কেউ বুঝতে পারলো না সত্যসুন্দর কি বলতে চাইছেন। লীলা বারবার জিজ্ঞেস করছে, আমাকে চিনতে পারছো না ?

সত্যসুন্দর ঠোঁট নাড়িয়ে বলতে চাইছেন, না।

এই অবস্থাতেও তাঁর রসবোধ একেবারে মরে যায় নি। দেশ বিদেশে যখনই যেখানে কোনো নারী তাঁকে প্রশ্ন করেছে আমাকে চিনতে পারছেন না ?—সত্যসুন্দর সব সময়েই সহাস্যে উত্তর দিয়েছেন না। মেয়েদের কি কখনো সঠিক চেনা যায় ?

নিজের স্ত্রী সম্পর্কেও তিনি সেই কথাটা বলতে চান। তাঁর ঠোঁট যে কিভাবে নড়ছে, তিনি তো দেখতে পাচ্ছেন না।

লীলা তাঁর বুকে হাত রাখলো। দেখে মনে হয় এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে।

একমাসের বেশী হয়ে গেছে স্বামীর অসুখ। এখনো কি এই জন্য চোখে জল আসে ? প্রথম আঘাতটা কেটে যাবার পর তো মন অনেক শক্ত হয়ে যায়। অবশ্য অনেক মেয়ের খুব সহজেই চোখে জল আসে। তবু লীলা, সাবধান, অভিনয় করো না, আমি ঠিক ধরে ফেলবো।

লীলা তার স্বামীর চশমাটা খুলে নেয় নি কেন ? চশমাটা খুলে নিলে সত্যসুন্দর খুব কম দেখতে পেতেন, ছোটখাটো ত্রুটি তাঁর চোখে পড়তো না।

লীলা জিজ্ঞেস করলো, তোমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে ?

কোনো রকম শক্ত জিনিস আর এখন সত্যসুন্দরকে খেতে দেওয়া হয় না। একটা মুরগীর সুপ এমনভাবে তৈরি করা হয়, যার মধ্যে মাংসগুলো একদম গলে যায়—সেই সুপ চামচে করে দিনে রাত্রে দু'বার খাইয়ে দেয় নার্স। লীলা কখনো খাওয়াতে আসে নি। স্বামীর প্রতি যত্ন দেখাবার জন্য লীলা তো নিজেও মাঝে মাঝে খাওয়াবার

চেষ্টা করলে পারতো। মায়েরা যেমন সন্তানকে খাওয়ায়। লীলার তো কোনো সন্তান হয় নি, সে এসব জানে না।

লীলা মুখ ফুটে কখনো সন্তান চায় নি। তবে, সব মেয়েরই সন্তান-তৃষ্ণা থাকে। এ ব্যাপারে সত্যসুন্দর একটু স্বার্থপরতাই দেখিয়েছেন। তিনি বাচ্চা-কাচ্চা তেমন পছন্দ করেন না। বাচ্চা মানেই তো কান্নাকাটি! তিনি প্রথম থেকেই জন্মনিয়ন্ত্রণ মানতে বাধ্য করেছেন লীলাকে। সন্তান পাওয়ার লোভেই কি সে প্রবীরের সঙ্গে……। না, না, তা কি করে হয়!

লীলা আবার জিজ্ঞেস করলো, তোমার কিছু খেতে ইচ্ছে করে?

মানুষের অভ্যাসটা কি সাঙ্ঘাতিক। লীলা তো জানেই যে সত্যসুন্দর কথা বলতে পারবেন না। তবু জিজ্ঞেস করছে কেন?

—গরম গরম কিছু খেলে ভালো লাগবে।

সত্যসুন্দর আবার মনে মনে একটা রসিকতা করলেন। তিনি যদি কোনোক্রমে জানান যে হ্যাঁ, আমার গরম গরম হিং-এর কচুরি খেতে ইচ্ছে করছে, তাহলে লীলা কি করবে? কচুরি তাঁর মুখ দিয়ে ঢুকবে না। তার চিবোবার ক্ষমতা নেই। তাহলে? লীলা কি কচুরিগুলোকে ভেঙে, হামাল দিস্তায় গুঁড়িয়ে, তারপর সেই গুঁড়ো-গুলোকে জলে গুলে তাকে খাওয়াবে? খুব একটা কচুরি খাওয়া হবে বটে।

লীলা হঠাৎ প্রবীরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, প্রবীর, তুমি চা কিংবা কফি কিছু খাবে? তুমি তো অফিস থেকে সোজা আসছো—তোমার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই।

প্রবীর বললো, না না, আমার কিছু দরকার নেই। আমি ডাক্তার সেনের চেম্বার ঘুরে এলাম। উনি আমাকে চা খাওয়ালেন…

সত্যসুন্দর ভাবলেন, লীলা তাঁকে চা কিংবা কফির কথা জিজ্ঞেস করলো না কেন? তিনি কফি খেতে ভালোবাসেন। কতদিন

কফি খান নি! রোজ সকালে তাঁকে এক কাপ করে গরম দুধ খেতে দেওয়া হয়। লীলা জানে, তিনি শুধু দুধের গন্ধ একদম সহ্য করতে পারেন না। দুধের সঙ্গে সব সময় অন্য একটা কিছু মিশিয়ে খেতেন। এখন অবশ্য তাঁর প্রাণশক্তি নেই। তাহলেও, যখন তাঁকে শুধু দুধ খাওয়ানো হয়, তাঁর ঘেন্না করে। এখন এক কাপ কফি পেলে বেশ লাগতো।

লীলা কফির কথাটা একবার বিবেচনাও করছে না। অন্যসময় রোজ অফিস থেকে ফিরেই তিনি বাড়িতে এসে কফি খেতেন। এখন তাঁর পছন্দ-অপছন্দ, ভালো-লাগা, মন্দ-লাগার কোনো মূল্যই দিচ্ছে না কেউ। হাতি কাদায় পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে।

লীলা তাঁর গালে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি আমাদের কথা শুনতে পাও? তোমার চোখ দেখে মনে হয়, তুমি শুনতে পাও। তুমি সব বুঝতেও পারো—কিন্তু তুমি কি আমাদের আর কখনো কিছু বলবে না?

সত্যসুন্দর কিছু বলার চেষ্টাও করলেন না। তিনি এখনো চোখের পলক ফেলতে পারেন ঠিকমত। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি যদি একটা চোখের পলকের ভাষা তৈরি করে নিতে পারেন, কেমন হয়? কতবার এবং কত তাড়াতাড়ি চোখের পলক ফেলা হলো তাই দিয়ে অনেক কিছু বোঝানো যেতে পারে। এতকাল তিনি ভাষাতত্ত্ব এবং ফোনেটিকস নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন—কিন্তু এসব ছাড়াও সারা পৃথিবীতে যে একটা নীরব ভাষা আছে, সে বিষয়ে কখনো খেয়ালই করেন নি। প্রেমিক প্রেমিকারা নীরব ভাষায় কত কী বলে।

লীলা জিজ্ঞেস করলো, চুরুট খাবে?

প্রবীর বললো, চুরুট খাওয়ার কথা কি ডাক্তাররা বলেছেন।

—ডাক্তারদের সব কথা মেনে চলা যায় না।

—তবু, ডাক্তার সেনকে একবার ফোন করবো?

—কোনো দরকার নেই। উনি চুরুট না খেয়ে এক দণ্ডও থাকতে পারতেন না। ওঁর মনে একটু আনন্দ দিতে হলে, এইসব দিতেই হবে।

সত্যসুন্দরের কোনো মতামত দেবার উপায় নেই। এই কদিনে তিনি চুরুটের অভাব একবারও বোধ করেন নি। এখন চুরুটের নাম শুনে মনে হচ্ছে, একবার পরীক্ষা করে দেখলে মন্দ হয় না, চুরুট খাওয়ার ক্ষমতাটুকু তাঁর আছে কিনা।

লীলা ওপরের ঘর থেকে চুরুট আনতে গেল। প্রবীর দাঁড়িয়ে রইলো কাচুমাচু হয়ে। লীলা আসার পর প্রবীর একটু সহজ হতে পেরেছিল. একা সত্যসুন্দরের সামনে সে স্বস্তি পাচ্ছে না।

কিন্তু ডাক্তারকে একটা ফোন করার কথা লীলা উড়িয়ে দিল কেন? শারীরবিদ্যা সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানও নেই লীলার। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর কি সত্যিই চুরুট খাওয়া উচিত? যদি কাশতে গিয়ে নিঃশ্বাস আটকে যায়! এই চুরুট খেতে গিয়েই যদি মৃত্যু হয় তাঁর?

লীলা অনায়াসে এই ঝুঁকি নিচ্ছে। প্রবীর আর লীলা যদি পরস্পরকে ভালোবাসে, তাহলে ওরা নিষ্কণ্টক হবার জন্য তো সত্যসুন্দরকে মেরে ফেলতেও পারে? গল্প-উপন্যাসে এরকম ঘটনা পড়া যায়। আর কিছু না, তাঁর মুখের ওপর একটা বালিশ চাপা দিয়ে কিছুক্ষণ ঠেসে ধরলেই তো হয়। এরকম রুগীর হঠাৎ মৃত্যু নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে যাবে না। সকলেই স্বাভাবিক মনে করবে।

লীলা বারবার তাঁকে কিছু খাওয়াবার কথা জিজ্ঞেস করছিল কেন? লীলা কি তাঁর খাবারের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিতে চায়? অন্য সময় নার্স খাবার খাওয়ায়, তখন বিষ মেশাবার সুযোগ নেই। এখন নার্স নেই, এখনই খুব সুবিধে। না, না, এত বোকামি করবে না—যদি ডাক্তারের কোনো সন্দেহ হয়, তাহলে তো দোষটা লীলার ঘাড়েই পড়বে!

তার চেয়ে গলা টিপে কিংবা বালিশ চাপা দিয়ে দম বন্ধ করে দেওয়াই অনেক সুবিধের।

সত্যসুন্দরের মাথাটা বালিশের একপাশে হেলে পড়েছে, সেটা ঠিক করে দেবার জন্য এগিয়ে এলো প্রবীর। সত্যসুন্দরের মাথার নিচে দুটো বালিশ, দু'পাশে দুটো পাশ বালিশ। প্রবীর একটা পাশ বালিশ তুলে নিল নিজের হাতে।

সত্যসুন্দর ভাবলেন, এইবার!

তাঁর একটু একটু ভয় করলো এবং তাতে তিনি আশ্চর্য হলেন। ভয় করছে কেন? মরতে তিনি ভয় পান? এই রকম জড়ভরত হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু তো অনেক বেশী সম্মানের। প্রবীর যদি তাঁকে খুন করতে পারে, তা হলে প্রবীর তো তাঁর উপকারই করবে।

তিনি স্থিরভাবে প্রবীরের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললেন, এসো প্রবীর। আমাকে মারো, আমি বীরের মতো মরবো।

প্রবীর বালিশটাকে ধুমধাম করে পিটিয়ে গোল করে আবার খুব সাবধানে পাশে রাখলো। মাথার বালিশে সত্যসুন্দরের মাথাটা সন্তর্পণে ঠিক করে দিয়ে মৃদু গলায় বললো, স্যার, আজকে ডাক্তার সেন অনেকটা আশা দিলেন। উনি তো জোর দিয়েই বলছেন, আপনি আবার ভালো হয়ে উঠবেন, কয়েক মাসের মধ্যেই।

হাসার ক্ষমতা থাকলে সত্যসুন্দর হোহো করে হেসে উঠতেন এই সময়। প্রবীরের মতন ছেলেও এখন মাঝে মাঝেই তাঁকে স্তোকবাক্য শোনাবার চেষ্টা করে! প্রবীর জানে না, সত্যসুন্দরের শরীরে অনেক যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে গেলেও মাথাটা এখনো ঠিক আছে। তাঁর চিন্তাশক্তি একটুও নষ্ট হয় নি। তিনি খুব ভালভাবেই জানেন, তিনি আর সেরে উঠবেন না। এখন শুধু মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা। এই রকম পক্ষাঘাত নিয়ে বেশীদিন বেঁচে থাকলে তার শরীরের কোনো কোনো

অংশ পচে গলে যাবে, দুর্গন্ধ বেরুবে, তখন আর কেউ কাছে আসতে চাইবে না। প্রবীরও আসবে না।

চিন্তাশক্তিটুকু আছে বলেই তিনি মরতে ভয় পাচ্ছিলেন।

প্রবীর আর লীলা যদি তাঁকে শিগগিরই খুন না করে, তা হলে তাঁকে আত্মহত্যার একটা উপায় চিন্তা করতে হবে। একটা কিছু উপায় বেরিয়ে যাবেই।

বিছানার ওপর লম্বা হয়ে আছে তাঁর বিরাট শরীরটা। এই ক'দিনেও একটুও রোগা হয় নি, প্রতিটি মাংসপেশী এখনো সচল মনে হয়, অথচ হাতের একটা আঙুল তোলার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই। এ কি অদ্ভুত জীবন!

অন্যান্য অঙ্গের মতন তাঁর যৌনাঙ্গেও কোনো স্পন্দন নেই। কিন্তু এখনো যৌন চিন্তা আছে। লীলা যখন খুব ঝুঁকে তাঁর সঙ্গে কথা বলে, তখন লীলার বুকের অনাবৃত অংশের দিকে তাঁর বারবার চোখ যায়। যে নার্সটিকে তাঁর সেবার জন্য রাখা হয়েছে, তারও স্বাস্থ্য বেশ ভালো। সে স্কার্ট পরে। একদিন সে অদ্ভুত একটা কাণ্ড করেছিল। সত্যসুন্দর ঘুমিয়ে পড়েছেন ভেবে নার্সটি অসভ্যের মতন তার উরু থেকে স্কার্ট সরিয়ে ঘামাচি না কি যেন খুঁটছিল। সত্যসুন্দর তা দেখে ফেলেছিলেন। শুধু দেখেন নি, লোভীর মতন তাকিয়ে ছিলেন সেদিকে। সত্যি, জীবন এত অদ্ভুত!

চুরুটের বাক্স নিয়ে লীলা ফিরে এসেছে। প্রবীরকে সে জিজ্ঞেস করলো, তোমার কাছে দেশলাই আছে।

প্রবীর পকেট থেকে দেশলাই বার করে দিল।

একেবারে বাচ্চাশিশুর মুখে যেরকম চুষিকাঠি পুরে দেওয়া হয় সেই রকমভাবে চুরুটটা সত্যসুন্দরের মুখে ঢুকিয়ে দিল লীলা। তারপর দেশলাই জ্বাললো।

সত্যসুন্দর ঠিক করলেন, তিনি আবার একটা খেলা খেলবেন।

তাঁর শরীরটা একেবারে এলেবেলে হয়ে গেলেও এখনো তাঁর সমস্ত ক্ষমতা যায় নি। এখনো তাঁর মাথা আছে। তিনি চুরুটটা খাবেন না। লীলা তাঁকে চুরুটটা টানাতে চাইলেই কি তিনি চুরুট টানবেন? তিনি কোনোদিন অন্য কারুর কথা শুনে চলেন নি।

বিষাক্ত চুরুটও নাকি পাওয়া যায়। ক্রাইম ফিকশানে থাকে এরকম, কয়েকবার ধোঁয়া টেনেই তারপর সব শেষ। লীলা কি সেইজন্যই চুরুট খাওয়াবার জন্য এত ব্যস্ত? কেন সে একবারও কফির কথা বলল না? তার কি উচিত ছিল না নিজের হাতে এক কাপ কফি বানিয়ে আনা! কফি খেতে কোনো ডাক্তারও বারণ করে না কখনো। সব ডাক্তারই এই অবস্থায় সিগারেট চুরুট খেতে বারণ করবে। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস না করে সে চুরুট খাওয়াতে পারে আর কফি খাওয়াতে পারে না?

বিয়ের পর কয়েকটা বছর কেটে গেছে, এখনো লীলা ঠিক মতন বুঝতে পারলো না সত্যসুন্দরের কী কী পছন্দ অপছন্দ। প্রথম প্রথম সে সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতো। সত্যসুন্দরের বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে কিছুতেই সহজ হতে পারতো না। তিনিই বহুভাবে ওর ভয় ভাঙাবার চেষ্টা করেছেন।

এখন যেন তাঁর ভয় একেবারে ভেঙে গেছে। এখন সে এমন ব্যবহার করছে যেন সে-ই এ বাড়ির কর্ত্রী, সত্যসুন্দর একটা শিশু। কিন্তু সত্যসুন্দরের মস্তিষ্কটা যে শিশুর নয়, একথা সে বুঝছে না কেন?

মৃত্যুভয় তিনি জয় করে ফেলেছেন। লীলা যদি তাকে মারতে চায় তো মারুক। কিন্তু চুরুটের ধোঁয়ায় তিনি মরতে রাজি নন।

সত্যসুন্দর দম বন্ধ করে রইলেন। নিশ্বাস না নিলে চুরুট ধরবে না।

লীলা বললো, ধরছে না কেন?

প্রবীর বললো, থাক না হয়!

—তুমি জান না, উনি চুরুট খেতে ভালোবাসেন, ধরিয়ে দিতে হবে। তুমি ধরিয়ে দেবে?

—আমি!

—তাতে কি হয়েছে? দাও!

সত্যসুন্দরের মুখ থেকে চুরুটটা বার করে নিয়ে লীলা সেটা এবার গুঁজে দিল প্রবীরের মুখে। তারপর দেশলাই জ্বেলে প্রবীরের মুখের কাছে আনলো। পরস্পরের দৃষ্টি নিবদ্ধ। সত্যসুন্দর তৃষিতের মতন চেয়ে রইলেন সেইদিকে। এর নাম নীরব ভাষা। এখন ওদের দুজনকে দেখলে বোঝা যায়, ওরা পরস্পরকে কত গভীরভাবে চায়।

চুরুটটা ধরে ওঠার পর লীলা সেটা নিয়ে সত্যসুন্দরের মুখে আবার ভরে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এবার ভালো লাগছে?

সত্যসুন্দর এখনো আবার দম বন্ধ করে আছেন। চুরুটটা বাইরে ফেলে দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই। কিন্তু ধোঁয়া ভেতরে ঢোকাবেন না কিছুতেই। চুরুটটা মুখের অনেকখানি ভেতরে ঢুকিয়ে দেবার ফলে দারুণ অস্বস্তি লাগছে।

একটা ব্যাপারে সত্যসুন্দর নিঃসন্দেহ হয়ে গেলেন। লীলা ধরেই নিয়েছে যে সত্যসুন্দর আর কখনো সুস্থ হয়ে উঠবেন না। না হলে অপরের এঁটো চুরুট এত সহজে তাঁর মুখে দিত না। লীলা নিজের এঁটো ঠোঁট তাঁকে দিতে পারে, কিন্তু এঁটো চুরুট? লীলা বুঝে গেছে, এসব ব্যাপারে প্রতিবাদ জানাবার সাধ্য সত্যসুন্দরের আর কখনো হবে না। এখন যে কদিন তিনি বেঁচে আছেন, সেই ক'টা দিন কাটিয়ে যাওয়া কোনোক্রমে।

সত্যসুন্দর এর মধ্যে খুব একটা দোষ দেখতে পেলেন না। মানুষকে ইতিহাস ও বস্তুবিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে সব কিছুই স্বাভাবিক মনে হয়। নড়াচড়ার ক্ষমতাহীন, বাক্যহীন একজন অথর্ব মানুষ এই সমাজের ভার ছাড়া আর কি? অন্য কারুর ব্যক্তিগত

জীবনে এই বোঝা আরও বেশী। কতদিন আর ভদ্রভাবে সহ্য করা যায় ?

তাহলে, লীলা যখন প্রথম এ ঘরে আসে তখন তার চোখে জলের আভাস ছিল কেন ? সে কি নিজের জন্য কাঁদছিল ? আর একটা ব্যাপারও জানা হয় নি। সেই সেদিন লীলা প্রবীরের বুকে কিল মারতে মারতে বলছিল, কেন ? কেন ? ঐ কেন বলার মানে কি ?

লীলা প্রবীরকে বললো, তোমার খাবার তৈরি করতে বলেছি। এক্ষুণি আনছে।

প্রবীর বললো, আমি কিছু খাবো না যে বললাম। সত্যি খিদে নেই।

—ঠিক আছে, এখন খেও না। রাত্রে এখানে খেয়ে যেও !

—আজ থাক্, আজ একটু তাড়াতাড়ি যাবো !

—দেখো প্রবীর, তুমি এত খাটাখাটুনি করছো যে আমার ভয় হচ্ছে !

—ভয়, কিসের ভয় ?

—হঠাৎ যদি তোমার কোনো অসুখ-বিসুখ হয়ে যায় ? তাহলে আমার কী উপায় হবে বলো তো ? আমায় কে দেখবে ?

প্রবীর একটু অস্বস্তি বোধ করলো। একবার আড়চোখে তাকালো সত্যসুন্দরের দিকে। তারপর বললো, আমার হঠাৎ অসুখ হবে কেন ? আপনিই বরং শরীরের যত্ন নিন।

লীলা বললো, প্রবীর, তুমি ছাড়া এখন আর আমার কেউ নেই। আমার বাবা তো একেবারে অপদার্থ।

সত্যসুন্দর মজা পেতে লাগলেন ওদের কথা শুনে। এক স্ত্রী তার স্বামীর সামনেই অন্য এক পুরুষের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করছে ! সত্যসুন্দরের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারছেন না লীলা ? আর ক'টা দিনই বা বাকি !

কথা বলতে বলতে লীলা প্রবীরের কাঁধে হাত রাখলো। অত্যন্ত

ঘনিষ্ঠ ভঙ্গি। সত্যসুন্দর এখন বুঝতে পারছেন লীলার চক্ষুলজ্জাটা কম। প্রবীরের কিন্তু লজ্জা আছে।

সে ঝট করে সরে গিয়ে বললো, আমি এবার যাবো!

প্রবীর বললো, স্যার আমি যাচ্ছি! আবার কাল সকালেই।—

সত্যসুন্দর কয়েকবার চোখের পলক ফেললেন। প্রবীর কি এর কিছু মানে বুঝতে পারবে? চেষ্টা করে দেখি।

—লীলাদি চললাম। দরকার হলে যে কোনো সময়ে ডাকবেন—

লীলা তখন বিছানার চাদর গুঁজছিল। মুখ না তুলেই বললো, আচ্ছা! প্রবীর ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার একটু পরেই লীলা বললো, আমি এক্ষুণি আসছি!

লীলা বোধহয় প্রবীরকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেছে। কিন্তু এত দেরি করছে কেন? কিংবা দেরি করে নি—প্রতিটি মুহূর্তকেই অসম্ভব দীর্ঘ মনে হচ্ছে। এরকম হতেও পারে। এ ঘরের দেয়ালে একটা ঘড়ি রাখলেও পারতো।

চুরুটটা কাৎ হয়ে সত্যসুন্দরের মুখ থেকে পড়ে গেল। তখনও সেটা জ্বলন্ত।

চুরুটটা গড়িয়ে পড়লো সত্যসুন্দরের ঘাড়ের কাছে। একটু সরে এলো তারপর ডানদিকে বুকের ওপর। সত্যসুন্দরের বুক ভর্তি বড় বড় লোম, গেঞ্জি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। চুরুটের আগুনে দু'একটা লোম পুড়ে কুঁকড়ে গেল। সত্যসুন্দর বুকের চামড়াতেও ঈষৎ আঁচ অনুভব করছেন! এতে তিনি ভয় পাবার বদলে উৎফুল্ল হলেন একটু। এইভাবে যদি তাঁর শরীরের সাড় ফিরে আসে।

সমস্ত বিশ্বকে ধ্বংস করে ফেলার মতন মানসিক শক্তি নিয়ে সত্যসুন্দর চাইলেন তাঁর ডান হাতখানা উঁচু করতে। পারলেন না। একটা আঙুলও নড়লো না। তখন তিনি চাইলেন তাঁর বুকটা পুড়ে যাক একটা গোল ফুটো হয়ে যাক্।

বুকের লোম পোড়ার শব্দ হলো পটপট করে। চামড়া পুড়ছে, একটা বিশ্রী ধোঁয়া উড়ছে।

সত্যসুন্দর যেন একটা চিনচিনে ব্যথা অনুভব করছেন। সত্যিই ব্যথা, না মনের ভুল? ব্যথা যদি হয় তাহলে তো খুবই আনন্দের কথা! তার মানে তাঁর শরীরে একটু একটু সাড় আসে। অন্তত আগুনের ছোঁয়া লাগলে তা অনুভব করা যায়।

সত্যসুন্দর মনে মনে বললেন, পুড়ুক, পুড়ুক!

চুরুট অনেক সময় আপনি আপনি নিভে যায়। এটা কিন্তু নিভলো না। মানুষের মাংস পুড়িয়ে বেশ আরাম পাচ্ছে মনে হয়। চামড়া পুড়িয়ে এবার মাংস ছুঁয়েছে বুঝি।

পুড়ুক, পুড়ুক, আরো পুড়ুক!

আচ্ছা, চুরুটটা কি বুকের মাংস পুড়িয়ে একেবারে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে যাবে? তাহলে তো আরও ভালো হয়। একটা গোল গর্ত করে চুরুটটা টুপ করে গিয়ে হৃৎপিণ্ডের ওপর পড়বে। তখনো কি সত্যসুন্দর শেষবারের মতন বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠতে পারবেন না?

লীলা ফিরে এসে চুরুটটা সেই অবস্থায় দেখে আঁতকে উঠলো। দৌড়ে এসে সেটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর সত্যসুন্দরের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাসি কান্না মেশানো ব্যাকুলতার সঙ্গে বলতে লাগলো, ওরে আমার সোনা। ইস, কি ভুল করেছি! ইস, চামড়া পুড়ে গেছে—কত ব্যথা লেগেছে তোমার। আমি একটা লক্ষ্মীছাড়া আমার কিছু খেয়াল থাকে না—আমি একেবারে তোমার যোগ্য না! তুমিই তো আদর দিয়ে আমার মাথাটা খেয়েছো! আহা রে, লক্ষ্মী সোনা, আমি তোমাকে মলম লাগিয়ে দিচ্ছি—

লীলা একদিকে শিশুর মতন সান্ত্বনা দিতে লাগলো সত্যসুন্দরকে —আবার তার সারা শরীরটাও উপহার দিয়েছে স্বামীকে। সে তার

ভারি স্তন ও উরু ঘষছে সত্যসুন্দরের গায়ের সঙ্গে। বড় লোভনীয় এই ভঙ্গী।

একটু আগে আগুনের আঁচে সত্যসুন্দরের ত্বকে যে সামান্য সাড়া এসেছিল এখন তার চেয়েও কম তাপ বোধ করছেন। অর্থাৎ প্রায় কিছুই উপভোগ করতে পারছেন না। অথচ মাথা দিয়ে তিনি অনুভব করছেন কি হচ্ছে ব্যাপারটা এবং আরও কি হতে পারতো।

শরীরের কাছে হেরে যাচ্ছে বোধশক্তি।

আবার বোধশক্তিরও সীমা আছে।

লীলা কামোত্তেজক ভঙ্গিতে শরীরটা ব্যবহার করতে করতেও চোখের জলে ভিজিয়ে দিচ্ছে সত্যসুন্দরের বুক। এই চোখের জলের কোনো গূঢ় মানে আছে কি? সত্যসুন্দর বুঝতে পারলেন না। কথা বলার ক্ষমতা চলে যাবার পর তিনি টের পাচ্ছেন, পৃথিবীতে কত রকম রহস্য আছে।

॥ ৪ ॥

দিনের পর দিন কেটে যায়, সত্যসুন্দরের সেই একই রকম অবস্থা। কোনো রকম উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় না। ঠোঁট যেটুকু নড়েছিল সেইখানেই থেমে আছে।

তাঁর কাছে লোকজনের যাওয়া-আসা ক্রমেই কমে আসছে। প্রবীর অবশ্য প্রত্যেক দিন দু'বেলা আসে।

কয়েকদিন ধরেই একটা অবাস্তব কথা সত্যসুন্দরের মাথায় ঘুরছে। মৃত্যুর আগে এর একটা উত্তর পাওয়া গেলে বেশ হতো।

সত্য এক, পণ্ডিতেরা তাকে বহুরকমে ব্যাখ্যা করে থাকেন। সেরকম বহু ব্যাখ্যার কথা সত্যসুন্দর নিজেও জানেন। কিন্তু সেই

আদি সত্যটা কি ? মৃত্যুর উপান্তে এসেও তিনি ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হলেন না, একবারও মনের ভুলে বলে ফেলেন নি, ভগবান, আমাকে বাঁচাও! তাহলে যাদের জীবনে ঈশ্বর নেই, তাদের জন্য কোনো সত্যও নেই ? এ জীবনটা বৃথা কেটে গেল। তিনি নিজের নাম বদলে সত্যসুন্দর রেখেছিলেন। এখন বুঝলেন, ভুল নাম রেখেছিলেন। তবু যাই হোক সত্যের সন্ধান না পেলেও তিনি সুন্দরকে দেখেছেন বহুরূপে।

লীলা যেন ইদানীং আরও সুন্দর হচ্ছে। বিবাহিত সম্পর্ক-বিরহিত প্রণয়ে নারীদের রূপ খোলে। তাদের যৌবন বৃদ্ধি পায়। এটা ঠিকই। অথচ লীলা তার স্বামীর যত্নের কোনো ত্রুটি করে না। একই ঘরে মেঝেতে বিছানা পেতে শোয় রাত্রে।

লীলা কিন্তু এ-পর্যন্ত একবারও প্রথম দিনকার সেই ঘটনা সম্পর্কে কোনো কৈফিয়ৎ দেয় নি সত্যসুন্দরের কাছে। যেন সেরকম কিছু ঘটেই নি। এখন সেই ঘটনা কেউ উল্লেখ করলে লীলা নিশ্চয়ই দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করবে। পুরুষদেরই বিবেকের কামড় বেশী থাকে। মেয়েরা সাধারণত অনেক কিছুই গোপন করার ক্ষমতা রাখে। সাধারণত। কারণ, সব সময় পুরুষ ও নারী সম্পর্কে এরকম তুলনামূলক আলোচনা করা যায় না। মেয়েদের মধ্যেও কেউ কেউ অসাধারণ আছে। সত্যসুন্দর এরকম একজনকে অন্তত দেখেছেন—অনেককাল আগে।

প্রবীর যখন তখন আসে বটে কিন্তু সত্যসুন্দরের সামনে বেশীক্ষণ বসে না। সে এখন বাড়ির ছেলের মতন, এ বাড়ির বেশীর ভাগ কাজকর্মই তাকে করতে হয়। ডাক্তাররাও আলোচনা করে প্রবীরের সঙ্গে।

প্রত্যেকদিন যাবার সময় প্রবীর একবার করে বিদায় নিয়ে যায় সত্যসুন্দরের কাছে। মুখখানা মলিন করে বলে, চলি স্যার!

তখন লীলাও ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এঘর থেকে বিদায় নেবার অনেক পরে নীচতলার সদর দরজা বন্ধ করার শব্দ হয়, সত্যসুন্দর ঐ শব্দটা শোনার জন্য কান পেতে থাকেন।

মোটামুটি কুড়ি পঁচিশ মিনিট বাদে প্রবীর যায়। বিদায় নেবার পর থেকে ঐ সময়টা সে কি করে? লীলার সঙ্গে নিভৃতে তার অনেক কিছু জরুরী কথা থাকে?

সত্যসুন্দর বুঝবার চেষ্টা করেন লীলার সঙ্গে প্রবীরের ভালোবাসাটা কি রকম? শুধু কি শারীরিক? শারীরিক হলে তো একদিন ফুরিয়ে যাবে? লীলা কি তা বোঝে না? হয়তো লীলার মধ্যে সুপ্ত সন্তান কামনা আছে। সেই সন্তান কামনার তাড়নায় অনেক নারী এরকম করে, তারা নিজেরাও এটা বোঝে না ঠিক।

সত্যসুন্দর বিবাহ করেছেন তিনজনকে, এ ছাড়াও অন্যান্য নারীদের সঙ্গে তাঁর সংসর্গ হয়েছে। কিন্তু সত্যিকারের ভালোবেসেছেন শুধু একবারই একজনকে। তিনি ছিলেন কাবুলে এক ভারতীয় অধ্যাপকের স্ত্রী। দু'জনেই বাঙালী মুসলমান।

সত্যসুন্দর তখন নিতান্তই যুবক। দুনিয়ায় কোন বন্ধন নেই। প্রায়ই যেতেন সেই অধ্যাপকের বাড়িতে। অধ্যাপক দম্পতি দু'জনেই খুব স্নেহ করতেন তাঁকে। বিশেষত অধ্যাপকের স্ত্রী, যিনি দেবী-প্রতিমার মতন সুন্দরী, ছিলেন খুবই দয়াময়ী। এই গৃহছাড়া বাউণ্ডুলে ছেলেটির ওপরে তাঁর খুবই মায়া পড়ে গিয়েছিল। প্রায়ই তিনি যত্ন করে সত্যসুন্দরকে নিজের বাড়িতে খাওয়াতেন। কখনো বিশেষ কিছু রান্না করলে চাকরের হাত দিয়ে চিঠি পাঠিয়ে ডাকিয়ে আনতেন তাঁকে।

সেই মহিলাটিকে সত্যসুন্দর অনায়াসেই দিদি বা বৌদির মতন শ্রদ্ধা করতে পারতেন। কিন্তু ঐ স্নেহ প্রীতির প্রতিদানে তিনি ঐ মহিলার প্রেমে পড়ে গেলেন। তিনি কাঙালের মতন ভালোবাসতেন

সেই মহিলাকে। একবার তাঁর চোখে চোখ ফেলাবার জন্যে তাকিয়ে থাকতেন উৎসুকভাবে।

ক্রমে অধ্যাপক-পত্নী বুঝতে পারলেন এই ব্যাপারটা। মেয়েরা পুরুষদের দৃষ্টি চেনে। মুখে কিছু বলেন নি, প্রথম প্রথম নীরব ভৎসনা করতেন দৃষ্টি দিয়ে, তারপর সত্যসুন্দরের কাতর চোখের দিকে তিনিও চোখ রাখতেন, কিন্তু আর কিছু না। তাঁর ব্যবহার ছিল খুবই সম্ভ্রান্ত।

একদিন তিনি সত্যসুন্দরকে বলেছিলেন কেন এরকম পাগলামি করছো?

সত্যসুন্দর বলেছিলেন, জানি না।

সত্যসুন্দর কোনোদিন যে সেই মহিলাকে নিজের করে পাবেন এমন আশা করেন নি, তিনি যে বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হন নি, এতেই ধন্য হয়ে গিয়েছিলেন। যদিও অধ্যাপক-পত্নীর সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ কমে গেল এর পর। আর তিনি যখন তখন খাওয়ান না, ডেকেও পাঠান না। অনুপস্থিতিতে অনেকেই তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে গল্পগুজব করতে আসতো। মহিলাটির সুন্দর চরিত্রের জন্য কেউ এ নিয়ে কোনো কথা বলে নি কখনো। শুধু সত্যসুন্দর সেই সব মজলিস থেকে বাদ পড়ে যেতে লাগলেন।

একদিন তিনি মহিলাকে বলেছিলেন আমি তো আর কিছু চাই নি। একটু শুধু চোখের দেখা। তা থেকেও আমাকে বঞ্চিত করলেন কেন?

অধ্যাপক-পত্নী বলেছিলেন আমি আর সকলের সঙ্গেই যখন খুশী দেখা করতে পারি, অনেকের বাড়িতেও যেতে পারি। শুধু তোমার ব্যাপারেই এখন আমার লজ্জা করে।

—আপনি চান না যে আমি···

—না, তা নয়। চাই না, বললে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু তোমার সামনে আর স্বাভাবিক হতে পারি না, অন্যরকম হয়ে যাই।

আফগানিস্তানে সেই সময় একটা গণ্ডগোল লাগায় অধ্যাপক-দম্পতি তাড়াহুড়ো করে লাহোর চলে যান। সত্যসুন্দর ছিটকে পড়েন অন্যদিকে। আর কখনো দেখা হয় নি। সত্যসুন্দর বাকি জীবনে ভোগ সম্ভোগ কম করেন নি, কিন্তু ভালবাসা বুঝি শুধু ঐ একেবারই। আর কিছু না, শুধু দেখা করার তীব্র ইচ্ছে।

প্রবীর আর লীলার মধ্যে ইচ্ছের টানটা কার বেশী? এরা অবশ্য চোখের দেখাতেই থেমে থাকে নি।

জানলা দিয়ে একফালি জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ঘরে। সত্যসুন্দর সেই দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন। এমন নির্মল স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না তিনি অনেকদিন দেখেন নি। কতদিন তো আকাশের দিকে চেয়ে দেখাই হয় নি।

জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিনি যেন কার মুখ দেখতে পেলেন। প্রথমে চিনতে পারলেন না। মাথাভর্তি কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, সদ্যফোটা পারিজাত ফুলের মতন মুখখানি। পারিজাত ফুল? কী রকম দেখতে সেই ফুল? একবার কুমায়ুনের কাছে এক সাধু তাঁকে বেশ বড়, প্রায় একটা বাটির মতন ভরাট সাদা পাহাড়ী ফুল দেখিয়ে বলেছিল, এর নামই পারিজাত। সত্যসুন্দর কৌতুক বোধ করেছিলেন। সেই ফুলের কথাই আজ মনে পড়লো। তারপর মুখখানাও চিনতে পারলেন। সেই অধ্যাপকের মুখ। কী যেন নাম? অনেক কাল আগের কথা, তবু নামটা তো ভুলে যাওয়ার কথা নয়! জানকী দেবী। হ্যাঁ, জানকীই তো—জানকী·····

সত্যসুন্দর যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারলেন, একটু আগে তিনি আফগানিস্তানের সেই দিনগুলির কথা ভাবছিলেন বলেই এখন জ্যোৎস্নার মধ্যে জানকীর মুখ দেখতে পাচ্ছেন। তবু এই মুখটি তাঁর খুবই জীবন্ত মনে হলো। তিনি হেসে বলতে চাইলেন, কেমন আছো?

কিন্তু তাঁর ঠোঁটে হাসিও ফুটলো না। কথাও বেরুলো না। সে ক্ষমতা তাঁর নেই।

তবু জ্যোৎস্নার মধ্যে সেই মুখ তাঁকে বললো, ভালো আছি।

সত্যসুন্দর মনের মধ্যে যথার্থ আরাম পেলেন। জানকী তাঁর মনের কথা বুঝতে পারে। এতদিন বাদেও। তিনি মনে মনে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে আজও তোমার মনে আছে।

—একদিনের জন্যও তো তোমাকে ভুলি নি!

—তুমি আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলে।

—তাড়িয়ে দিয়েছিলাম? হয়তো দিয়েছি, কিন্তু অপমান তো করি নি। আমি ভেবেছিলাম, তুমি বুঝতে পারবে।

—তার মানে?

—তোমাকে ভয় পেতাম। আর তো কারুকে কখনো ভয় পাই নি!

—ভয়? আমাকে? আমি তো শুধু চোখের দেখা দেখতে যেতাম তোমাকে। আর তো কিছু দাবি করি নি!

—সেইজন্যই তো। তোমার সামনে এলে আমি দুর্বল হয়ে পড়তাম। আর কারুর কাছে তো দুর্বল হই নি কখনো। তুমি তখন ছাত্র, তোমার সামনে তখন অনেক কাজ, তোমার কথা চিন্তা করে রাত্রে আমার ঘুম হতো না।

—কাবুল থাকতে হঠাৎ চলে গিয়েছিলে, যাবার আগে একটা খবরও দাও নি। একবার দেখা করতেও দাও নি।

—সেও তো তোমারই জন্য। নইলে তুমিও হয়তো পাগলের মত কাবুল ছেড়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসতে।

—জানকী, তুমি জানো না, তুমি আমার কতখানি ক্ষতি করেছো!

—ক্ষতি করেছি? তোমার?

—তারপর থেকে আমি কোনো নারীকে আর ভালোবাসি নি।

আমি নারীকে ভেবেছি শুধু ভোগের সামগ্রী—শুধু সুন্দর পুতুলের মতন, খেলা করার কিংবা আদর করার—ভালোবাসার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

—তুমি জীবনে কত উন্নতি করেছো!

—এর কী মূল্য আছে? সব কিছু শুকনো, অর্থহীন। আমি ভালোবাসি নি, তাই আমাকেও কেউ আর ভালোবাসে নি! তোমার ওপর অভিমান করে আমি ভালোবাসার ওপরেই অভিমান করেছিলাম! জানকী, তুমি একি করলে।

—আমি তো তোমাকে ভালোবেসেছি। আমি তোমার কাছে তাই এসেছি!

জানকী এসে সত্যসুন্দরের মস্তক স্পর্শ করলো। না, তাও না। কল্পনা কখনো এত জোরালো হতে পারে না যা তা স্পর্শসহ হবে। বরং তিনি দেখলেন, জ্যোৎস্নার রেখাটা সরে গেছে জানলা থেকে।

এতদিন পর জানকীর কথা মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি খুব দুর্বল বোধ করলেন। তিনি কাঁদলেন। শিশুর মতন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। আসলে তাঁর শরীরও নড়লো না, চোখ দিয়ে জলও এলো না। সব কান্নাই মনে মনে।

হঠাৎ আর একটা ঘটনায় সত্যসুন্দর সামান্য বিচলিত হয়ে পড়লেন।

লীলা এসে একদিন সকালে বললো, টাকা পয়সা কিছু নেই! তুমি যদি সইটাও অন্তত করতে পারতে! ব্যাংক থেকে কিছু তোলা যাচ্ছে না!

লীলা সত্যসুন্দরের শ্লথ ডান হাতটা তুলে আঙুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। একটা ছোট্ট চিমটি কেটে জিজ্ঞেস করলো টের পাচ্ছো?

সত্যসুন্দর রীতিমতন চমকে উঠেছিলেন। তাঁর শরীরে কিছু বোধ না হলেও চিমটিটা লেগেছিল তাঁর বুকের মধ্যে।

লীলা তাঁকে দিয়ে চেক বইতে সই করাতে চায়। একটা চেকেই সব টাকা তুলে নেওয়া যেতে পারে। এ কিসের ষড়যন্ত্র?

টাকা পয়সার ব্যাপারটাই বড় নোংরা। মনের মধ্যে নানারকম নোংরা চিন্তা আনে। সত্যসুন্দর নিজেকে এক ধমক দিলেন।

সত্যিই তো টাকার দরকার। টাকা পয়সা তো ফুরিয়ে যাবেই। তাঁর চিকিৎসার জন্য কি কম খরচ হয়েছে। সত্যসুন্দরের অনেক টাকা ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন জায়গায়, কিন্তু সই করে না দিলে তো কেউ টাকা দেবে না।

লীলার নিজস্ব খরচের জন্য তিনি একটা আলাদা অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কয়েক হাজার টাকা ছিল মাত্র। লীলা সেই টাকাই বোধ হয় এতদিন খরচ করেছে। আর কতদিন চলবে?

লীলার সঙ্গে তিনি কোনো জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খোলেন নি। কারণ, তিনি কখনো এরকম অসুস্থ হয়ে পড়বেন, স্বপ্নেও ভাবেন নি।

সন্ধেবেলা প্রবীর এসেছে, তার সামনেই লীলা বললো ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে না পারলে কি হবে বলো তো?

প্রবীর অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। মৃদু গলায় বললো দেখি, আমি যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারি।

—তুমি আর কত করবে?

সত্যসুন্দর বুঝলেন. তাঁকে শোনানো হচ্ছে যে প্রবীর এখন এই সংসার চালাতে সাহায্য করছে।

অহংকারী সত্যসুন্দর, তুমি এক সময় মনে করতে দুনিয়ার কারুকে তুমি গ্রাহ্য করো না! এবার বুঝে দেখো! তুমি অন্য কারুর সঙ্গে কোনোপ্রকার সম্পর্ক রাখতে চাইতে না। এখন তোমার সংসার তোমার স্ত্রীর প্রেমিক চালাচ্ছে।

সত্যসুন্দর ভাবলেন, একসময় শরীরটা আমার দাস ছিল। এখন আমি শরীরের দাস। কিংবা শরীর আমাকে বন্দী করেছে। আমি ইচ্ছা করলে পায়ের আঙুলটাও নাড়াতে পারি না এখন।

লীলা প্রবীরকে বললো, আজ তুমি দাড়ি কামাও নি কেন?

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে লীলা প্রবীরের গালে হাত দিল।

প্রবীর একটু সরে গিয়ে বললো, এমনিই, মানে সময় পাই নি।

—তোমাকে এত ঘোরাঘুরি করতে কে বলেছে! তুমি তো যথেষ্ট করেছো। এই করে করে এবার নিজের শরীরটা খারাপ করবে!

লীলা আবার প্রবীরের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। তার গলা জড়িয়ে ধরে অভিমানিনীর মতন বললো, তুমি আজকাল আমাকে একটুও আদর করো না।

প্রবীর ছিটকে সরে যাবার চেষ্টা করে বললো, কি হচ্ছে কি!

সত্যসুন্দরও ভাবলেন, কি হচ্ছে কি! লীলার কি মাথা খারাপ? তিনতলার ঘরটা এখন একদম ফাঁকা পড়ে থাকে। লীলা তো অনায়াসেই সেখানে প্রবীরকে ডেকে নিয়ে কাজের কথা বলার ছলে এইসব যা খুশী করতে পারে। এখানে কেন? এমনকি লাইব্রেরি ঘরগুলোতেও—

লীলা জ্বলজ্বলে চোখে তাকালো সত্যসুন্দরের দিকে। একটা অসভ্য ভ্রূ-ভঙ্গি করলো। তারপর বিশ্রী গলায় বললো, কি বুড়োদাদু তুমি রাগ করবে? করো না যত ইচ্ছে রাগ, কারুকে তো বলতে পারবে না! প্রবীর আমার, বুঝলে? সম্পূর্ণ আমার। ওকে নিয়ে আমি যা খুশী তাই করতে পারি!

প্রবীরকে আর বাধা দেবার সুযোগ না দিয়ে লীলা আবার তার কণ্ঠলগ্না হয়ে তার ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ালো। প্রবীর ছটফট করছে। লীলা ফেলে দিল বুকের আঁচল, সেদিনের মতন প্রবীরের বুকে ছোট ছোট কিল মেরে বলতে লাগলো, কেন, কেন, কেন?

সত্যসুন্দর আজও এর কোনো মানে বুঝতে পারলেন না।

প্রবীর বললো, লীলাদি, আপনি, শান্ত হোন!

—আবার লীলাদি! তোমার লজ্জা করে না?

—চলো, বাইরে চলো!

—না, আগে বলো, আমাকে ভালোবাসো না?

সত্যসুন্দরের মনে হলো এটা একটা ফিলমের দৃশ্য। বাংলা ফিলমের মতন অবাস্তব। লীলার কথাগুলো কিরকম কৃত্রিম শোনাচ্ছে। প্রবীরের চেহারা সুন্দর, কিন্তু অধিকাংশ ফিলমের নায়কের মতন সে ব্যক্তিত্বহীন এবং আড়ষ্ট।

প্রবীর লীলাকে ছাড়িয়ে দ্রুত বাইরে চলে গেল। লীলা কিন্তু সঙ্গে গেল না। সে এগিয়ে এলো সত্যসুন্দরের খাটের দিকে, চোখ দুটো যেন জ্বলছে।

সত্যসুন্দর ভয় পেলেন। মনে হলো, লীলা তাঁকে মারবে না তো? মারলেও তিনি ব্যথা পাবেন না, তবু ভয় হচ্ছে কেন? ভয় তো শরীরে হয় না, ভয়ের বাসা মানুষের মনে।

লীলা মারলো না। বললো, কি, রাগ করেছো? রাগ ছাড়া তোমার আর কি-ই বা করার আছে?

সত্যসুন্দর মনে মনে বললেন, তুমি ধরেই নিয়েছো আমি রাগ করেছি। আশ্চর্য। এত সহজে ধরে নেওয়া যায়!

লীলা বললো, বেশ করবো!

সত্যসুন্দর মনে মনে বললেন, তোমার স্বাস্থ্য আরও সুন্দর হয়েছে, রঙ হয়েছে উজ্জ্বল, এখন তুমি যা করবে তাই-ই মানাবে।

লীলা চেঁচিয়ে ডাকলো প্রবীর, প্রবীর!

প্রবীর বোধ হয় দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সে আবার ফিরে এলো। শান্তভাবে বললো, স্যারকে এখন একটু ঘুমোতে দাও!

লীলা বললো, তোমার স্যার তো সারা দিন এবং রাত্তিরই ঘুমোচ্ছেন! আর কত ঘুমোবেন?

লীলা দরজা বন্ধ করে দিয়ে এলো। নির্লজ্জার মতন শাড়িটা খুলে ফেলে বললো, প্রবীর তুমি আমাকে নাও।

প্রবীর ইতস্তত করছে।

লীলা আবার বললো, আমি এত করে বলছি, তবু তুমি দ্বিধা করছো!

প্রবীর বললো, লীলা, চলো আমরা ওপরে যাই। অনেক কাজের কথা আছে।

লীলা বাঘিনীর মতন গর্জে উঠে বললো, কোনো কাজের কথা নেই! কেন, ওপরে যেতে হবে কেন? এখানেই ওর চোখের সামনেই, তুমি আমাকে নাও! আমি ওকে গ্রাহ্য করি না। ও তো একটা পাথর!

প্রবীর তবু লীলার বাহু ছুঁয়ে বললো, কথা শোনো, লক্ষ্মীটি, চলো, ওপরে চলো!

—না!

—আলোটা নিভিয়ে দাও!

—কোনো দরকার নেই!

লীলা ব্লাউজের বোতামে হাত রেখে হুকুমের সুরে বললো, খুলো দাও, তুমি আমার জামাটা খুলে দাও!

সত্যসুন্দর বেশ মজা পাচ্ছেন। লীলা যে এতখানি নির্লজ্জা হতে পারে, এটা তাঁর কাছে একটা নতুন আবিষ্কার। তাঁর এই এক ঘেয়ে শুয়ে থাকা অবস্থায় তবু এই ব্যাপারে বেশ খানিকটা নতুনত্ব পাওয়া গেল।

মেয়েরা কি এতটা পারে? তিনি এর আগে অনেকবার লক্ষ্য করেছেন, ঘরে একটা কুকুর-বেড়াল থাকলেও মেয়েরা প্রণয় কার্যে লজ্জা পায়। আর তিনি তো একটা জলজ্যান্ত মানুষ। বেশ্যারাও

ঘরের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি রাখতে দেয় না। লীলা বললো, পাথর। পাথর? সত্যসুন্দরকে কি পাথর বলা যায়? পাথরের তো চিন্তা শক্তি নেই! সত্যসুন্দর বরং ব্যগ্র বোধ করছেন। লীলা আর কতদূর যায়, তা দেখবার জন্য।

লীলা নিজেই ব্লাউজের বোতাম খুলে ফেললো। ব্রা-টা ছুঁড়ে ফেললো মাটিতে। ভরাট সুন্দর স্তন দুটি যেন দুটি স্থলপথ। সত্যসুন্দর বেশ তৃপ্তি পেলেন। সামান্য একটা রোগা পটকা মেয়ে ছিল লীলা, তাকে তিনিই এরকম গড়ে তুলেছেন।

লীলা আবার প্রবীরকে হুকুম দিল, এসো!

প্রবীর সত্যসুন্দরের দিকে একবার আড়চোখে তাকালো। তারপর যেন সে আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। প্রবলভাবে লীলাকে আলিঙ্গন করে চুম্বন করলো।

চুম্বনটি বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়। দেখে সত্যসুন্দর বেশ তৃপ্তি পান। দৃশ্যটি নিশ্চিত সুন্দর—দু'জন যুবক যুবতী মুখ চুম্বন করছে। সিনেমাতে এরকম কত দেখা যায়। দু'জনেই পরিচিত হলে একটু অস্বস্তি লাগে। বিশেষত একজন যদি নিজের স্ত্রী হয়—তবু সত্যসুন্দর মনে মনে স্বীকার করলেন এটা দেখে তিনি খুশীই হয়েছেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে লীলা এই চুম্বনে যতখানি আবেগ মিশিয়েছে, সেরকম আবেগের সিকিভাগও কোনোদিন সত্যসুন্দরকে দেয় নি।

প্রবীর তার হাতটি রেখেছে লীলার পিঠে। লীলা নিজের শরীরটা যেন প্রবীরের শরীরের মধ্যে মিশিয়ে দিতে চায়। চুম্বনে চুম্বনে যেন ওরা পরস্পরের প্রাণরস শুষে নিচ্ছে।

এবার ওরা আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লো মাটিতে। সত্যসুন্দর আর পুরাপুরি ওদের দেখতে পাচ্ছেন না। মাথাটা উঁচু করতে পারলে হতো। ইস, এই নাটকটা শুরু করার আগে লীলা যদি তার মাথার নিচে আর একটা বালিশ দিয়ে দিত!

দরজায় কে যেন ধাক্কা দিল। ওরা দু'জনে শুনতে পায় নি। সত্যসুন্দরই বলতে চাইলেন, দরজায় ছিটকিনি দেওয়া আছে তো ? কণ্ঠস্বর থাকলে তিনি নিশ্চিত ওদের সাবধান করে দিতেন এই সময়।

তার আর দরকার হলো না। প্রবীরই নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে চলে গেল দরজার কাছে। লীলা শাড়িটা তুলে নিয়ে আলমারির পাশে সরে দাঁড়ালো।

প্রবীর কার সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে গেল বাইরে।

লীলা ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো সত্যসুন্দরের বুকের ওপর। কান্নার বৃষ্টিধারা নেমেছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে বললো, তবু তুমি কিছু বললে না ? তবু বললে না ? আমি এত খারাপ। আমি তোমার মান সম্মান সব নষ্ট করেছি! তুমি আমাকে বকবে না ? তুমি আমাকে মারো, মারো আমাকে।

সত্যসুন্দরের ক্ষমতা থাকলে তিনি একটা হাত তুলে লীলার পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতেন এখন। লীলা কত ছেলেমানুষ!

চোখের জল মুছে লীলা একটু সুস্থির হলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, ডাক্তারবাবু বলেছিলেন হঠাৎ মনে কোনো আঘাত পেলে তুমি ভালো হয়ে উঠতো পারো! তাই আমি তোমার চোখের সামনে······লাজলজ্জা সব বিসর্জন দিয়ে······

ক্ষমতা থাকলে সত্যসুন্দর এখানে হাসতেন। এতক্ষণ যা হয়ে গেল, তা কি ডাক্তারের নির্দেশে ? আধুনিক বিজ্ঞান কত উন্নত হয়েছে। ডাক্তার কি বলে দিয়েছিল ঠিক কটা চুম্বন আর ক'বার আলিঙ্গন দরকার ? সেই জন্যই ব্যাপারটা অবাস্তব নাটক নাটক লাগছিল। লীলা যে অতি কাঁচা অভিনেত্রী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

লীলা স্বামীর চোখের সামনে কুলটা সেজে তাঁকে সুস্থ করতে

চেয়েছে। সত্যি সুস্থ হয়ে উঠলে সত্যসুন্দর কি এটা মেনে নিতেন ? অন্য স্বামীরা কি নেয় ? নাকি ততটুকুই সুস্থ হওয়া দরকার, যাতে তিনি চেকে সই করতে পারেন।

লীলা আজ এত বেশী করে কাঁদছিল কেন ? স্বামীর সামনে এরকম করতে হল সেই অনুতাপে ? কিংবা, সার্থক হলো না বলে ? অসময়ে কেউ এসে দরজা ধাক্কা দেওয়ায় যে অতৃপ্তি রয়ে গেল, তার জন্যও কান্না পাওয়া অসম্ভব কি ? এইসব জটিল প্রশ্নের ঠিকঠাক উত্তর না পেলে মরতেও ইচ্ছে করে না।

ক'দিন পর এইটা যেন লীলার একটা খেলা হয়ে দাঁড়ালো। বাড়িতে এত জায়গা থাকতেও সে সত্যসুন্দরের চোখের সামনেই প্রণয় লীলা চালাতে চায়। প্রবীরের আড়ষ্টতা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। বহুবার রিহার্সালের পর যেমন হয়। এখন সে অনেক সময় নিজে থেকেই লীলাকে জড়িয়ে ধরে খুনসুটি করে। লীলা সত্যসুন্দরের দিকে মুখ ভেংচি কেটে বলে, এই বুড়ো দাদু, দ্যাখো, দ্যাখো—। এই বলে জিভ দিয়ে প্রবীরের গাল চেটে দেয়।

সত্যসুন্দর যাতে ভালো করে দেখতে পারেন, সেইজন্য ওরা দু'জনে ধরাধরি করে তাঁকে উঁচু করে বসিয়ে দেয়। পেছনে দেয় বালিশের ঠেস।

সত্যসুন্দরের একঘেয়ে লাগে এখন। ওরা বোঝে না কেন যে বরাবর এই একই জিনিস ওদের দু'জনের কাছে আনন্দদায়ক হতে পারে বটে কিন্তু অন্য কেউ আনন্দ পাবে না। এটাও কি ডাক্তারের নির্দেশ ?

একদিন দুপুরে সত্যসুন্দর ঘুমিয়ে ছিলেন, হঠাৎ কার হাতের ছোঁয়া পেয়ে চমকে উঠলেন। বহুকালের পুরানো স্নেহের স্পর্শ।

তিনি চোখ মেলে তাকালেন, তাঁর পিসীমা। বুড়ি এখন প্রায় অন্ধ, কেউ হাত ধরে নিয়ে না এলে হাঁটাচলা করতে পারেন না।

এতদিন কেউ তাঁকে নিয়ে আসে নি। আজ নিজেই অতিকষ্টে এসেছেন।

সত্যসুন্দর প্রথমে খুব চমকে উঠেছিলেন। তাঁর চোখে খানিকটা তন্দ্রা ছিল, হঠাৎ চোখ মেলে, সামনে বুড়ি পিসীকে দেখে তিনি ভাবলেন তাঁর মা এসেছেন। মা? সে তো কবেকার আগেকার কথা! কৈশোর বয়সে তিনি সংসার পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন। পরিবারের লোকজনকে মনে করেছেন নিজের উন্নতির পথে একটা বাধা। পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে ঘোরাঘুরি করে অনেক বছর পর যখন দেশে ফিরেছিলেন তখন তাঁর মা মারা গেছেন—পরিবারের আর কারুর কোনো উদ্দেশও পাওয়া যায় নি। সত্যসুন্দরও কোনো রকম দুঃখ বোধ করেন নি। জীবনে তাঁর কোনো পিছুটান নেই। যা যাবার তা গেছে। শুধু রক্তের সম্পর্কের মানুষ বলতে রয়ে গেছে শুধু এই পিসী।

তবু এতদিন পরে পিসীকে দেখে তাঁর মায়েরই কথা মনে পড়লো। কোন্ বিস্মৃতির ওপার থেকে তাঁর মা রক্ত মাংসের মূর্তি ধরে এসেছেন। গায়ে সেই আতপ চালের গন্ধ, বার্ধক্যে কুঁচকে গেছে মুখ, তবু তার মধ্যে মাখানো রয়েছে স্নেহ। পরনের সাদা থানখানা শতচ্ছিন্ন আর মলিন। হঠাৎ সত্যসুন্দরের কষ্ট হলো। এতদিন পর তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন, মা, আমি তোমার এমনই অধম ছেলে যে তোমাকে একটা ভালো কাপড়ও দিতে পারিনি! মা, আমি তোমাকে কিছুই দিই নি, শুধু নিয়েছি!

পিসী খুব কাছে এসে মুখ ঝুঁকিয়ে ডাকলেন, ও রাজু! রাজু!

সত্যসুন্দর বললেন, মা!

—তুই কেমন আছিস, বাবা?

—মা, তুমি এসেছো, আমি এবার ভালো হয়ে যাবো। মা, তুমি আমার সঙ্গেই থাকবে তো!

পিসী সব কথা শুনতে পান না। তিনি সত্যসুন্দরের নীরবতাও দেখতে পেলেন না। তিনি সত্যসুন্দরের গায়ে হাত ছোঁয়াতেই ঘোর কেটে গেল। এতো মা নয়। ছোঁয়াটা অনেকটা মায়ের মতন, তবু মায়ের নয়। মায়ের হাতের স্পর্শ তাঁর মনে আছে!

পিসী সত্যসুন্দরের গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, ও রাজু, রাজুরে! তোর নাকি খুব অসুখ?

লীলা বোধ হয় পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। জানতে পারলে বুড়িকে আগেই বিদায় করে দিত। এখন টাকার টানাটানি চলছে, তবু যে লীলা এখনো দুটো খেতে দেয়, এই ঢের।

বুড়ি বললো, ও রাজু, কথা বলিস না কেন? তোর মাকে কাল স্বপ্নে দেখলাম। সে বললো, আমার ছেলেটা বুঝি আবার সন্ন্যাসী হয়ে যাবে!

সত্যসুন্দর বললেন, পিসী!

তারপর ডানহাত দিয়ে পিসীর হাতখানা চেপে ধরলেন।

এবং তারপরই তাঁর বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগলো। মনে মনে নয়, তিনি সত্যি পিসী কথাটা উচ্চারণ করেছেন। তাঁর ডানহাত সত্যিই পিসীর একটা হাত চেপে ধরেছে।

এমন উত্তেজিত বোধ করতে লাগলেন যে মনে হলো এক্ষুনি হার্ট ফেইল করে যাবে। তিনি মনে মনে বারবার বলতে লাগলেন, সত্যসুন্দর, শান্ত হও! শান্ত হও!

—তোর মা মরার সময় আমাকে বলে গিয়েছিল, ঠাকুরঝি, আমার ছেলেটা সাধু হয়ে গেছে, তাকে আর দেখলাম না। সে যদি ফিরে আসে, আমার নাম করে কালীঘাটে পূজো দিও। আমি বলেছিলাম, আচ্ছা, আচ্ছা! কিন্তু সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম। কালই পূজো দেবো—আমার নাতির বাড়িতে যাবো।

সত্যসুন্দর আস্তে আস্তে আবার নিজের ডানহাতখানা তুললেন।

সত্যিই তুলতে পারলেন। তিনি মুগ্ধভাবে তাকিয়ে রইলেন সেই হাতখানার দিকে, তাঁর নিজেরই হাত, তাঁর চোখের সামনে—এরকম যে আর কোনো দিন হবে, তিনি ভাবেন নি।

তিনি পাঁচটা আঙুল ছড়ালেন, একটু চেষ্টা করতেই তাঁর কনুটাও উঁচু হলো, তিনি পিসীর মুখটা স্পর্শ করলেন। বার্ধক্যে কোঁচকানো মুখ, তবু যেন দারুণ আরাম হলো। শিশু যেমন হঠাৎ হঠাৎ এক একটা কথা বলে, তেমনি তিনি বললেন, মা!

পিসী তা বুঝতে পারলেন না। তিনি আবার বললেন, আমি কালই পুজো দেবো!

সত্যসুন্দর বললেন, না। পুজো, না!

কথাটা বলেই সত্যসুন্দর সচকিত হয়ে উঠলেন। কথা বলতে পারায় আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা সতর্কতা বোধও তাকে পেয়ে বসলো। লীলা যেন শুনতে না পায়, লীলা যেন টের না পায়।

অথচ সেই মুহূর্তে সত্যসুন্দরের এরকমও ইচ্ছে হলো, তিনি খুব জোরে হেসে উঠতে পারেন কিনা, তা একবার পরীক্ষা করে দেখেন। হা-হা-হা-হা হো-হো-হো-প্রবলভাবে চিৎকার করে সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। তিনি আবার ফিরে এসেছেন, তিনি, সত্যসুন্দর, আর জড়ভরত নেই। তিনি আবার মানুষের ওপর হুকুম করে কথা বলতে পারবেন।

পরম মায়া ভরে তিনি হাতখানা এবার নিজের মুখেই বুলোতে লাগলেন।

পিসী বললেন, আমার এক নাতি কাল সকালে এসে আমাকে নিয়ে যাবে ক'দিনের জন্য। তাই তোকে বলতে এলাম। আমাকে তো কেউ ওপরে আনে না। কাল যাবো, আবার একমাস পরেই ফিরে আসবো।

সত্যসুন্দর ফিসফিস করে বললেন, আচ্ছা!

সেইদিন বিকেলে সত্যসুন্দর দেখলেন শুধু ডানহাত নয়, ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটাও তিনি নাড়াতে পারছেন। বোধ হয় শরীরের একদিকের অবসাদ চলে যাচ্ছে। তারপর আরেক দিক?

ডান হাত ঠিক হয়েছে, এখন তিনি অনায়াসেই চেক সই করতে পারেন। তাঁর টাকার অভাব নেই। প্রবীরের সব ঋণ তিনি শোধ করে দিতে পারেন এক কলমের খোঁচায়।

সন্ধেবেলা যখন লীলা আর প্রবীর ঘরে এলো, তিনি কিছুই বললেন না। সবকিছু বলারই একটা বিশেষ মুহূর্ত আছে তো!

এখন আর লীলা কিংবা প্রবীর তাঁর কোনো খবরও জিজ্ঞেস করে না। নিজেদের মধ্যে কথা বলে। টাকা পয়সার প্রশ্ন নিয়ে একটু খিটমিটি হয়, ঠিক যেন স্বামী-স্ত্রীর মতন। আবার একটু পরেই বেলেল্লাপনা শুরু হয়ে যায়। একটা জ্যান্ত নির্জীব মানুষ যেন ওদের আনন্দ বাড়িয়ে দিয়েছে আরও। সেদিন ওরা দু'জনেই সত্যসুন্দরের খাটে এসে বসলো। খুনসুটি করতে করতে মগ্ন হয়ে গেল নিজেদের মধ্যে।

সত্যসুন্দর ওদের অলক্ষ্যে ডান হাত দিয়ে খাটের পায়াটা চেপে ধরলেন। মুঠো করলেন হাতটা। জোর লাগালেন, কতটা জোর আছে হাতে? সত্যসুন্দরের মনে হলো, তিনি খাটের পায়াটা মড় মড় করে ভেঙে ফেলতে পারেন। বাঁ হাতটা এখনো সম্পূর্ণ অবশ, ডান হাতে তাঁর সেই আগেকার অসুরের মতন শক্তি ফিরে এসেছে।

লীলা আর প্রবীর জড়াজড়ি করছে খাটের ওপর। লীলার পিটটা তাঁর হাতে লাগছে। লীলা কি বুঝতে পারছে না যে এই হাত আর আগের মতন নেই? বুঝবার চেষ্টাও করছে না। চুম্বনের সময় চকাস চকাস শব্দ করছে। ঠিক এই মুহূর্তে, সত্যসুন্দর যদি ডান হাতটা তুলে লীলার গলা টিপে ধরেন? এই একহাতেই তিনি লীলার গলাটা মুচড়ে দিতে পারেন।

শিশু যেমন মাঝে মাঝে ইচ্ছে করেই নিজের খেলনাটা ভেঙে ফেলে, সেইরকম, সত্যসুন্দরের একবার সাধ হলো লীলাকে শেষ করে দিতে। তিনি হাতটা তুললেন পর্যন্ত। ওরা যদি হঠাৎ দেখে ওদের সামনে সত্যসুন্দরের উত্তেজিত হাত? কী রকম চিৎকার করে উঠবে ওরা?

সত্যসুন্দর হাতটা নামিয়ে নিলেন। কামমোহিত নারী-পুরুষের রতি ক্রীড়ার মধ্যে বিঘ্ন ঘটানো অনুচিত। এমনকি তার মধ্যে যদি একজন নিজের স্ত্রীও হয়। পাছে তাঁর হাতটা আবার অবাধ্যপনা করে, তাই তিনি সেটাকে কামড়ে ধরলেন একবার। আবার, ওদের অলক্ষ্যে পাশে শুইয়ে রাখলেন।

লীলা এক সময় সত্যসুন্দরের ডানহাতটা তুলে নিল নিজের হাতে। বিদ্রূপ করে বললো, খুব রাগ হচ্ছে? ইচ্ছে হচ্ছে না আমাকে একটা চড় কষাতে? এই নাও, আমি মেরে দিচ্ছি!

লীলা সত্যসুন্দরের হাতটা নিয়ে নিজের গালে আলতো করে আঘাত করে। তারপর হি-হি করে হেসে হাতটা ছেড়ে দেয় আবার। সত্যসুন্দর হাতটাকে থপাস করে পড়ে যেতে দেন।

আদুরে খুকীর মতন লীলা বললো, এবার আমি মারি?

দারুণ জোরে সে সত্যসুন্দরের গালে এক চড় কষায়।

প্রবীর জিজ্ঞেস করে, স্যার, আপনার লাগে নি তো, না?

সত্যসুন্দরের গালটা জ্বালা করছে। তিনি ভাবলেন, এই কি সুসংবাদটা জানাবার সেই বিশেষ মুহূর্ত? তিনি বলে উঠবেন কি লীলা আমি চেক সই করতে পারি, তুমি ইচ্ছে হলে আমার সব টাকা তুলে নিতে পারো!

অথবা সে কথা না বলে কি অপ্রত্যাশিতভাবে সত্যিই লীলার গালে একটা চড় কষাবেন?

হঠাৎ এরকম আনন্দ বা আঘাত পেয়ে লীলার যদি আবার

পক্ষাঘাত হয়ে যায়? থাক দরকার নেই। তিনি ছুটোর একটাও করলেন না।

তিনদিন পরে সত্যসুন্দর দেখলেন, তাঁর ডানহাত ও ডান পা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ! বাঁ দিকটা এখনো অসাড় আছে। তবু তিনি উঠে দাঁড়িয়ে চলাফেরা করতে পারেন কোনোরকমে পা ঘষে ঘষে।

তখন মধ্যরাত। সত্যসুন্দর খাট থেকে নেমে ঘরের কোণে রাখা লাঠিটা নিয়ে নিলেন। এই লাঠিতে ভর দিয়ে মনে হয় তিনি অনেক দূর যেতে পারবেন।

তিনি একটুক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বড় একটা নিঃশ্বাস নিলেন। এই পৃথিবীতে তিনি আবার নিজের অধিকার ফিরে পেতে চান। কি অধিকার?

ঘরের মেঝেতে বিছানা পেতে লীলা রোজ যেমন ঘুমোয়, আজও তেমনি ঘুমিয়ে আছে। সারা রাত নীল আলো জ্বলে। তিনি একদৃষ্টে লীলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার যুগপৎ রাগ স্নেহ জাগতে লাগলো। এক একবার মনে হলো, তাঁর একটা হাতেই যা জোর আছে, তাই দিয়ে তিনি লীলার গলাটিপে ধরে মেরে ফেলতে পারেন। আবার মনে হলো ঘুমোলে ওকে কিরকম নিষ্পাপ দেখায়। যেন একটা শিশু। জীবনটা নিয়ে কি যে করছে নিজেই জানে না।

সত্যসুন্দর বেরিয়ে এলেন সেই ঘর থেকে। নিজেকে মনে হচ্ছে খাঁচা থেকে মুক্ত কোনো পশুর মতন। শুধু বেঁচে থাকার আনন্দ ছাড়া আর কোনো আনন্দ নেই এখন। জীবন যখন অপর্যাপ্ত ছিল তখন মৃত্যু সম্পর্কে কোনো চিন্তা ছিল না। তখন আনন্দের কতরকম উপকরণ খুঁজতে হতো। এখন বেঁচে থাকাই একমাত্র কথা।

তবু হঠাৎ তাঁর মুখখানা আবার বিষণ্ণ হয়ে গেল। তিনি অনুভব করলেন, এই পৃথিবীতে এখন আর লীলা, প্রবীর আর সত্যসুন্দর —

এই তিনজনের একসঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার নেই। লীলা আর প্রবীর তাঁকে খারিজ করেই দিয়েছিল। এখন তিনি আবার বেঁচে উঠলে কি ওরা দু'জন আর স্বাভাবিক থাকতে পারবে? কী ধরনের সম্পর্ক হবে? প্রবীর তাঁর চোখের সামনে লীলাকে ভোগ করেছে, এখন কী আর সে সতেজ সত্যসুন্দরের সঙ্গে সহজভাবে দাঁড়াতে পারবে? সে ক্ষমতা প্রবীরের নেই। আর লীলা?

এক হতে পারে, যদি প্রবীর আর লীলা দু'জনেই আলাদা গিয়ে কোথাও থাকে। তিনি ওদের ছেড়ে দেবেন। কিন্তু···সত্যসুন্দর নিজের হাতে গড়েছেন লীলাকে—এখন তাকে তুলে দিতে পারবেন প্রবীরের হাতে?

সত্যসুন্দরের বুকের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলছে ক্রোধ। সেই ক্রোধ যেন হিংস্র পশুর মতন গর্জন করছে। তিনি কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছেন না।

লাঠি ঠক্‌ঠক্ করে তিনি আবার ফিরে এলেন ঘরে। দাঁড়ালেন এসে লীলার শিয়রে। তাঁর ঠোঁটে বিকৃত ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠলো। ডাক্তারের উপদেশে লীলা তাঁর সামনে প্রবীরের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেছে? আর প্রথম দিন? যেদিন সত্যসুন্দর হঠাৎ দরজা খুলে ওদের দু'জনকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখেছিলেন?

লাঠির এক আঘাতে তিনি লীলার মাথাটা ছাতু করে দেবেন? তা হলেই তিনি মুক্ত। তিনি জীবনে কারুর জন্য মায়া-দয়া বোধ করেন নি। লীলা যদি আজ মরে যায়, তিনি একটুও শোক করবেন না। তিনি চলে যাবেন অন্য কোথাও। নতুনভাবে জীবন শুরু করবেন। সে শক্তি তাঁর এখনো আছে।

লীলা তখন হঠাৎ চোখ মেললে দেখতে পেত, মাথার কাছে যেন দাঁড়িয়ে আছে যমদূত।

সত্যসুন্দর আবার লাঠিটা নামিয়ে আনলেন। বারবার ইচ্ছে

হলেও লীলাকে তিনি আঘাত করতে পারছেন না। আসলে খুন জখমের প্রবৃত্তি তাঁর মধ্যে নেই। তিনি ক্রোধী কিন্তু হিংস্র নন।

তিনি আবার চলে গেলেন সেখান থেকে।

তিনি এসে ঢুকলেন একটা লাইব্রেরি ঘরে। বসলেন ছোট টেবিলে। চার পাশে র‍্যাক ভর্তি রাশি রাশি বই। তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয়।

বইগুলিতে ধুলো জমেছে। কেউ পরিষ্কার করে নি। টেবিলের ওপর থেকে একটা বই তুলে নিলেন। বইটার মাঝখানের একটা পাতায় কাগজ গোঁজা। বইটা এ পর্যন্ত পড়ে তিনি রেখে গিয়েছিলেন। বাকি পৃষ্ঠাগুলি কি আর পড়া হবে কোনো দিন?

সত্যসুন্দর দেখলেন তাঁর বুকের মধ্যে এক বিরাট নিঃস্বতা। আর বইটা পড়া সম্পর্কে তাঁর কোনো আগ্রহই নেই। তিনি এ সব ছেড়ে চলে যাবেন। সন্ন্যাসীর মতন? এক ধর্মহীন সন্ন্যাসী! লীলাকেই তিনি সব টাকা পয়সা দিয়ে যাবেন। লীলা আর প্রবীরই ভোগ করুক। ওদের জীবন আছে, ওদের জন্যই তো ভোগ।

জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে লুটোচ্ছে ঘরের মেঝেতে। বাইরের আকাশটাও দেখা যায়। আজ বড সুন্দর রাত। অসুস্থ হবার পর থেকে সত্যসুন্দর নতুন করে উপভোগ করছেন জ্যোৎস্নার রূপ। এমন নির্মল জ্যোৎস্না দেখলেই মনে পড়ছে জানকী দেবীর মুখ। কেন এতদিন পর জানকী আবার ফিরে এলো তাঁর মনে?

তিনি খুব দুঃখিত গলায় ফিসফিস করে বললেন, জানকী, তুমি আমার একি ক্ষতি করলে? তোমার জন্য আমি আর কারুকে ভালো বাসতে পারি নি, আবার এতদিন বাদে তুমিই কেন ভালোবাসার কথা মনে পড়িয়ে দিলে? জীবনটা তাই আজ এত শুকনো, এত নির্মম মনে হচ্ছে। এখন এই জীবন নিয়ে আমি কী করবো! জানকী, তুমি কোথায়?

সত্যসুন্দর মনে মনে হিসেব করলেন. এতদিনে জানকীর বয়েস

প্রায় ষাটের কাছাকাছি হবে নিশ্চয়ই। বেঁচে না-ও থাকতে পারেন। কিন্তু মনশ্চক্ষে তিনি জানকীর যে মুখখানা দেখতে পাচ্ছেন তা সেই যৌবনের সুন্দর মুখ। সেই জানকী আজ আর কোথাও নেই, যেমন সেই সত্যসুন্দরও আর নেই। এখন কি আর তিনি নতুন করে ভালোবাসতে পারবেন ?

সত্যসুন্দর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাঁর চোখ জ্যোৎস্নাময় আকাশের দিকে স্থির নিবদ্ধ। এই আকাশ, এই জ্যোৎস্না কখনো পুরোনো হয় না। শুধু মানুষই পুরোনো হয়ে যায়।

টেবিলের ড্রয়ার খুললেন। এখানেও রয়েছে একটা চেক বই, কলম। বেশ সাবলীলভাবেই চেকের পাতায় নাম সই করতে পারলেন নিজের। কোনো টাকার অঙ্ক বসালেন না। লীলা সব নিক। সেই বাল্যকালে তিনি যেমন একবার ঘর ছেড়ে বাউণ্ডুলের মতন বেরিয়ে পড়েছিলেন, এখন সেইরকম আবার বেরিয়ে পড়বেন। দেখা যাক পারা যায় কিনা!

ড্রয়ারে কয়েকটা চুরুট ও একটা লাইটারও ছিল। হঠাৎ ইচ্ছে হলো একটা চুরুট খেতে। এতে কি আনন্দ পাওয়া যাবে আর ?

চুরুটটা মুখে দিয়ে তিনি এক হাতে টিপে টিপে লাইটারটা জ্বালালেন। চুরুটটা ধরাবার পর দু'একটা টান দিতেই তাঁর খুব কাশি এলো। তিনি বিরক্ত হলেন। কাশির শব্দ শুনে যদি লীলা জেগে ওঠে ?

টেবিলের ওপর কতগুলো কি পুরোনো চিঠিপত্র পড়েছিল। খোলা হয়নি। অভ্যেস বশত একবার ভাবলেন চিঠিগুলো পড়বেন। কিন্তু মন বদলে ফেললেন পরক্ষণে! কি হবে আর এসব দিয়ে!

ছোট ছেলের মতন খেলাচ্ছলে তিনি লাইটারের আগুন ছোঁয়াতে লাগলেন চিঠিগুলোতে। কয়েকটা জ্বলে উঠলো, তাঁর ভালো লাগলো। জ্বলন্ত চিঠিগুলো তিনি ফেললেন বাজে কাগজের ঝুড়িতে সেখানেও আগুন ধরলো। বইয়ের ঘরে এরকম আগুন বিপজ্জনক।

কিন্তু হঠাৎ-ই এইসব বই ও মানুষের মেধার ওপর অসম্ভব রাগ এসে গেল তাঁর। তিনি জ্বলন্ত কাগজ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন।

আগুন যখন বেশ ভালো মতন ধরে উঠলো ধোঁয়ায় বসে থাকা কষ্টকর হলো, তখন সত্যসুন্দর কি ভেবে যেন চেক বইটাও ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আগুনে। লাইটার চুরুট সব। তারপর ভাবলেন, ঘুমন্ত লীলাকেও পাঁজকোলা করে তুলে এনে এই আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে দিলে কেমন হয়?

কিন্তু তিনি সেরকম কিছুই করলেন না। বই পোড়া বিশ্রী ধোঁয়া আর দাউদাউ আগুনের দৃশ্য দেখতে লাগলেন চুপ করে বসে।

লীলা জেগে উঠেছে, বাড়ির অন্যদেরও কোলাহল শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ আগুনের শিখা লকলক করে বেরুলে এই ঘর থেকে অন্য ঘরে। সত্যসুন্দরের গায়ে আঁচ লাগছে। তিনি শীতকালের আগুন পোহানোর মতন তাঁর শরীরের অবশ বাঁ দিকটা ঘুরিয়ে দিলেন আগুনের দিকে। ওদিকটা এখনো অসাড়—ঠিক ব্যথা বোধ নেই, তবু চিনচিনে একটা অনুভূতি হচ্ছে।

সত্যসুন্দরের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠলো। তিনি সজ্ঞানে সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে অগ্নিপ্রবেশ করবেন। লীলার কণ্ঠস্বর তিনি শুনতে পাচ্ছেন। কিন্তু ক্রমেই যেন অস্পষ্ট হয়ে আসছে। লীলা কি এ ঘরে ঢোকার চেষ্টা করবে? নাকি এতক্ষণে বাড়ির বাইরে চলে যাবার চেষ্টা করছে? তাই যাক, লীলা বাঁচুক।

আশ্চর্য, এই অগ্নিতাণ্ডবের মধ্যেও জানলার জ্যোৎস্নাটা দেখা যাচ্ছে এক এক বার। সত্যসুন্দর সেদিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে।

তবু। সত্যসুন্দর স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন একটা। তাঁর মনে হলো, এটাই ঠিক হয়েছে। ঐ জ্যোৎস্নাটুকু যেন ভালোবাসা। তাই তিনি ওখানে যেতে পারলেন না। এই আগুনের মধ্যেই তাঁর স্থান।

একজন মুক্তি চেয়েছিল

জমাদারকে আট আনা বক্‌শিশ দিয়ে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে কাল রাত্রে আরাম-চেয়ারে শুয়ে ছিল, তবু যথেষ্ট ঘুম হয় নি। একটা বড়ো মাড়োয়ারী সারারাত ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত নির্দিষ্ট বিরতিতে ঘঙ ঘঙ করে কেশেছে। বহুদিনের পুরোনো কাশির শব্দ, বিষম বিরক্তিকর। পাশের মেয়েদের ঘর থেকে একটা ঘুঙুরের শব্দ আসছিল কিছুক্ষণ—শেষরাতের তন্দ্রার মধ্যেও সে শব্দ থামে নি।

এখন কলকাতার গরম থেকে হঠাৎ এই পাহাড়ী শহরের ঈষৎ শীতের ভোরবেলা আশাতীতভাবে ভাল লেগে গেল অরুণের। বড় বড় সাদা ইউক্যালিপটাস গাছের সরল দেহ থেকে সুবাতাস বইছে। স্টেশন থেকে বাইরে এসে চারখানা গরম জিলিপি খেয়ে অত্যন্ত তৃপ্তি পেয়ে সে আরও দু খানার অর্ডার দিল। তারপর একখানা নোন্‌তা নিমকি খাবার পর দু ভাঁড় চা নিল পরপর। একজন মোটাসোটা ভদ্রলোকের হাত থেকে কুকুরের চেনটা ছুটে গেছে—কুকুরটাকে ধরবার জন্য ছুটে ছুটে ক্লান্ত হয়ে ভদ্রলোক দোকানের সামনে দাঁড়িয়েই বললেন, দেখি এক টাকার জিলিপি। তারপরেই বললেন, শালা! কুকুরটা একটু দূরে ইয়ার্কির ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। ভদ্রলোক একটুকরো জিলিপি ছুঁড়ে দিতেই কুকুরটা চলে এল কাছে। একটা লাল রঙের বাস কোনদিন থামবে না এমন বেগে ছুটে গেল। পিছনে পিছনে একরাশ লাল ধুলো উড়ে যাচ্ছে। সেই ধুলোর মধ্য দিয়েই তিনটি মেয়ে ভেসে উঠলো। তিনজনই সতেজ চেহারার যুবতী, কি কথায় হাসাহাসি করছে—এবং তিনজনেই অরুণকে এক-দৃষ্টিতে দেখছে—যেন ওকে বহুদিন ধরে চেনে। পিছন থেকে জোর

হাওয়া দিলে ওদের চুল এবং আঁচল উড়ে যায় এবং ধুলো পরিষ্কার হয়। পরিষ্কার আলোয় দেখা যায় ওরা যথোচিত সুন্দরী নয় এবং মোটেই অরুণের দিকে তাকিয়ে নেই।

ওষুধের দোকানের সিঁড়িতে সিগারেটের দোকান, পাশে পোস্টঅফিস। একটা সিগারেট ধরাবার পর দেখল, পোস্টঅফিস তখনও খোলে নি। দুবার জোরে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়বার পর সে মনস্থির করল। তারপর সেখানে দাঁড়িয়ে বেশ আরাম করে সিগারেটটা শেষ করে বুকপকেট থেকে খামটা বার করতে যাবে সেই সময় এক সৌম্য বৃদ্ধ বললেন, আরে, অরুণ না! কবে এলে? অরুণ চকিতে পিছন ফিরে দেখে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে মুখের একটা রেখাও পরিবর্তিত হতে দিল না।

—মাকে দেখতে এসেছো বুঝি?

—আমার নাম অরুণ নয়, ভুল করেছেন। অত্যন্ত বিনীত তার কণ্ঠস্বর। ভদ্রলোক চশমাটা খুলে পরিষ্কার করতে গিয়ে রুমাল বার করে প্রথমেই মুখ মুছে ফেললেন। তারপর বললেন, আমি ভেবেছিলাম পরিতোষ রায়ের ছেলে বুঝি। চোখে আজকাল—

অরুণ সোজা ডাক্তারখানার ভিতরে ঢুকে গেল তারপর খাকি খামটা বার করে নামটা আবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ডাঃ কনকেন্দ্র সেনের ঠিকানাটা বলবেন দয়া করে?

ফুলঝাড়ু দিয়ে কাউন্টার পরিষ্কার করতে করতে গম্ভীর কম্পাউণ্ডার জবাব দিল, মেন্টাল হসপিটালে দশটার পর যাবেন, দেখা হবে।

—তার বাড়ির ঠিকানাটাই আমার একটু দরকার।

লোকটা মাথা তুলে আপাদমস্তক অরুণকে দেখলো। তারপর ঠিক সেইরকম গম্ভীর গলাতেই বলল, কাঁকে যাবার রাস্তায় একটা জাহাজ মার্কা বাড়ি আছে—তার তিনখানা বাড়ি পরে। বাগানে পাথরের সিংহ আছে। বাড়ির নাম 'শান্তি'।

এতক্ষণ একবারও মুখ না তুলে যে লোকটি একপাশে বসে কাগজ পড়ছিল—সে এবার এক ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে বলল, 'ভেতরে জ্যান্ত বুলডগ আছে কিন্তু, সাবধান, না ডেকে ঢুকবেন না।

—আপনি হসপিটালে দেখা করলেই পারতেন।

—আপনার সঙ্গে আমি একটু ব্যক্তিগত কথা বলতে চাই। লোহার গেটের পাশে খুরপি হাতে যে লোকটিকে অরুণ ডাঃ কনকেন্দ্র সেনের কথা জিজ্ঞেস করেছিল—তিনিই ডাক্তার সেন। লোকটির সম্বন্ধে যা ভেবেছিল—ঠিক তেমন নয়। ডাক্তারের চেহারা আন্তর্জাতিক টেনিশ খেলোয়াড়ের মত—সেইরকম ঝকমকে চেহারা। মুখে পঞ্চাশ বছরের যুবকত্ব। এই ধরনের লোকই অফিসে দারুণ গম্ভীর থেকে মুখে ঘাম জমিয়ে বাড়িতে এসে নিজের ছেলের সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে খেলা করে। আসুন ভেতরে, ডাক্তার অরুণকে বললেন।

মোরাম বিছানো রাস্তার উপরে হলুদ রাধাচূড়া ফুল ঝরে পড়েছে। একটু দূরে একটা ছোট্ট পাহাড়ের মাথায় মন্দির—তার চূড়ায় তির্যক-ভাবে সূর্যের আলো। মাথার উপরের এমন নীল আকাশ সে আগে দেখে নি, আর কখনও দেখবে না এই ভেবে অরুণ ড্রইংরুমে ঢুকে সোফায় না বসে চেয়ারে বসলো।

বলুন আপনার কথা ; জোসেফ্! জোসেফ্! সাওতাল চাকর এসে মুখ বাড়াতেই বললেন, দু কাপ চা দাও। এই বাবুর জন্যে দুটো কলা আর বিস্কুট দেবে, আমার জন্য শুধু চা। বলুন।

অরুণ একটুক্ষণ চুপ করে রইল। আপনার নাম সই করা চিঠি পেয়ে আমি এসেছি, চোদ্দ বছর পর আমার মা ভাল হয়ে উঠেছেন, তাঁকে নিয়ে যেতে হবে।

—বাঃ, হ্যাপি নিউজ নিশ্চয়ই খুব খুশী হয়েছেন !

—না, ঠিক হ্যাপি নয়। আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন। আচ্ছা, আমার মা যদি আবার পাগল হয়ে যান্ তবে কি আবার আপনারা তাকে ভর্তি করে নেবেন?

—দেখি চিঠিটা। হৈমবতী দেবী, হ্যাঁ, মনে আছে, শী ইজ কমপ্লিটলি কিওরড্। আবার ফিরে আসবার প্রশ্নই ওঠে না!

—আচ্ছা, তার কি স্মৃতি নষ্ট হয়ে গেছে? তিনি আগে কি ছিলেন তাকি তার মনে আছে?

সব মনে আছে! ছেলের কথা দু'একদিন ধরে খুবই বলছেন।

ডাক্তারের শেষ কথাটা ঠিক এইমাত্র বানানো কিনা অরুণ ঠিক বুঝতে পারল না। সে বলল, আর উপায় নেই ডাক্তারবাবু, মায়ের আর ফিরে যাবার উপায় নেই!

—কেন? ডাক্তার উদাসীনভাবে তাকালেন।

—আমাদের পরিবারের সকলের ধারণা ছিল, আমার মা আর কোনদিন ভাল হবেন না। আজ থেকে এগারো বছর আগে আমার বাবা আবার বিয়ে করেছেন। নতুন ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁর এখন নতুন সংসার। সেখানে কি করে মাকে নিয়ে যাব? চোদ্দ বছরের অন্ধকার জীবনের পর তাঁকে আর কোন গভীরতর অন্ধকারে নিয়ে যাব—অরুণ যেন এটাই বলতে চাইল।

কনকেন্দ্র সেন একটু চুপ করে থেকে বললেন, সে কথা তাঁকে আস্তে আস্তে বুঝিয়ে বললেই হবে। সে দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।

বুঝিয়ে বলার পরও তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

—কেন, কষ্ট হবে? আপনার বাবা পছন্দ করবেন না? নতুন মা অত্যাচার করবেন? আপনি ইয়ংম্যান, আপনি আপনার মায়ের দায়িত্ব নিতে পারবেন না?

—না।

—না? কেন?

একটু থতমত খেয়ে অরুণ হঠাৎ দ্রুত বলে উঠল, ডাক্তারবাবু, আমি যে মুক্তি চেয়েছিলাম!

মুক্তি কথাটা শুনে কনকেন্দ্র সেন এমন চমকে উঠলেন যে, মনে হল তিনি যেন শুনেছেন দুঃখ। ঠিক সেইরকম কণ্ঠেই তিনি বললেন, কিসের মুক্তি।

অরুণ নিচু হয়ে চায়ের কাপটা টেনে নিল। সে যা ভেবেছে, তা কি মুখে বুঝিয়ে বলতে পারবে? চায়ের কাপ থেকে একটা পাতলা ধোঁয়ার জাল উঠে এসে তার মুখ আবছা করে দিচ্ছে। হঠাৎ ঢং ঢং করে দেয়াল ঘড়িটা বেজে উঠল। অরুণ মন দিয়ে গুণে দেখলো, আটটা। চোখ তুলে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে দেখলো ঘড়ির কাঁটায় ন'টা বেজেছে। নটা? অথচ সে-যে গুণলো আটটা বেজেছে। কাঁটায় ভুল না শব্দের ভুল? শব্দের ভুল, অরুণের মনে হল, আটটা শব্দ বেজে একটি অনুচ্চারিত শব্দ তাকে বলল, সাবধান!

একটা তেজী উজ্জ্বল লাল মোরগ-ফুল জানলার পাশে এমনভাবে ফুটে আছে যেন সে বাগানের আলো থেকে ঘরের ভিতরের অন্ধকার দেখতে চায়।

...তিনতলার ছাদে ছোট ঘর; ওপরে টিন দেওয়া। সেইখানে অরুণ রোজ রাত্রে শোয়। নেয়ারের খাটের কয়েকটা পট্টি ছিঁড়ে গেছে—তাই মাঝখানটা ঝুলে নিচু হতে হতে এখন প্রায় ভূমি স্পর্শ করে। রাত্তিরবেলা সব কাজ সেরে হারাধন চাকরটা এসে শোয় দরজার কাছে। হারাধনের নাক ডাকে, ওর সারা-গায়ে বর্বর শরীরের গন্ধ ওর নিঃশ্বাসে অশ্লীল ঘুমের গন্ধ—কেননা প্রায় প্রতি রাত্রে অরুণের ঘুম আসে না। এক একদিন মাঝ রাত্তিরে যখন বৃষ্টি নামে, কোথাও কোনও শব্দ নেই, বৃষ্টির শব্দ ছাড়া—তখন ধূসর আকাশের দিকে চেয়ে অরুণ ভেবেছে, একদিন আমি মুক্তি পাব।

মায়ের কথা মনে পড়ে না মুখ মনে পড়ে না, শুধু ছবি দেখেছে দেয়ালে। বাবা আবার বিয়ে করবার পর নতুন মা যখন এল—তখন কিছুদিন অরুণকে জানানো হয় নি। সে ছিল ব্যারাকপুরে মামাবাড়িতে। যেদিন সে জানলো, সেদিন একলা ডেকে নিয়ে বাবা বলেছিলেন, স্পষ্ট মনে আছে, তোকে আর খুকুকে দেখাশুনো করবার জন্য ওকে নিয়ে এলাম, খুব যত্ন করবে দেখিস। খুকু ছিল ওর বোন, সদ্য এক বছরের, তার প্রতি সত্যিই যত্নের কোন অভাব হয়নি, কিন্তু ছ'মাস বাদেই খুকু মারা গেল। শিশুর অভিমানী বড় আপোসহীন, তীব্র।

নতুন মায়ের নাম মলয়া, দেখতে খুব খারাপ নয় কিন্তু নিচের ঠোঁটটা একটু ওল্টানো, সুতরাং দর্পিতা। সব সময় মাথায় ঘোমটা দিয়ে নিঃশব্দে কাজ করতো প্রথমে এসে, দুপুরবেলা বাবা অফিস যাবার পর তাকে নিঃশব্দে কাঁদতে দেখেছে। কোন কোন দুপুরে একটা লম্বা ধিড়িঙ্গে লোক আসতো গোপনে দেখা করতে। একদিন বন্ধ-দরজার আড়ালে মলয়ার কথা শুনেছিল, আঃ বুকটা জ্বলে গেল, জ্বলে গেল!

জ্বলুক্ জ্বলুক্—সেই লোকটির কণ্ঠস্বর।

কিছুদিন পর থেকে সেই লোকটি আর আসে নি—তারপর পাঁচ বছরের মধ্যেই মলয়ার তিনটি বাচ্চা হয়ে গেল।

মলয়া অরুণের সঙ্গে কোনদিনই খুব খারাপ ব্যবহার করেননি—কিন্তু খারাপ ব্যবহার না-পাবার জন্যই অরুণ তার প্রতি মনে মনে ফুঁসে উঠেছিল। বাবা তার সঙ্গে খুব আন্তরিক ব্যবহার করতেন—নিজের সামর্থ্যের বাইরেও ছবির বই, হঠাৎ নতুন ভেলভেটের প্যাণ্ট কিনে আনতেন তার জন্য। পয়সা দিতেন মাঝে মাঝে এমনিই। তার যখন চোদ্দ বছর বয়েস—তখন একদিন অজান্তে মলয়ার পা মাড়িয়ে দেবার জন্য বাবা তাকে ঠাস করে এক চড় মেরে ছিলেন।

নিজের দোষহীনতায় সে এমন অবাক হয়ে গিয়েছিল যে কেন সে এমন অপমান পেল প্রথমে বুঝতেই পারে নি। তারপর দপ্‌ করে জ্বলে উঠল চোদ্দ বছরের ছেলের ভয়ংকর রাগ। টাইমপীস্‌ ঘড়িটা সে ছুঁড়ে মেরেছিল বাবার দিকে। বাবার কাঁধে গিয়ে ঘড়িটা লেগেছিল।

থাক্‌, থাক্‌ ওকে আর মারতে হবে না। মলয়া বলেছিল। তখন অরুণের মনে হয়েছিল, বাবাকে নয়, ঘড়িটা ছুঁড়ে মারা উচিত ছিল মলয়ার দিকেই।

সেদিন সে এমন মার খেয়েছিল—যে চিবুকের কাছে সেই কাটা দাগ এখনও আছে। তারপর থেকে বাবা তার সঙ্গে আর কখনও কথা বলেন নি—মাত্র পরশুদিন ছাড়া।

চিবুকের কাটা দাগে হাত বুলোতে বুলোতে অনেক রাত্রে তার ঘুম হয় নি। আমার নাম অরুণ নয়, আমার বাবার নাম পরিতোষ নয়, আমি অন্য লোক হয়ে যাব, সে ভেবেছে। একদিন হঠাৎ মাঝ-রাত্রে উঠে সে তার পড়ার টেবিলটা তিনতলার ছাদ থেকে ফেলে দিল। প্রচণ্ড শব্দ। সকলে জেগে উঠতে সে জলের কুঁজো এবং কাচের শিশি দুটো ছুঁড়ে ফেলল। বাবা এসে ধরল অরুণকে। তখন তার চোখ জ্বলছে। অকারণে তাকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। প্রথমবার বি-এস-সি ফেল করবার পর ছাদের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে অরুণ ভেবেছিল আত্মহত্যা করবে। না, পরে সে ভেবেছিল, সে মুক্তি নেবে। তার মা নেই, বাবা নেই, তেমন কোন আত্মীয় স্বজন নেই, সে সত্যিকারের একা দ্বিধাহীন মানুষ হবে। সে হবে সম্পূর্ণ বন্ধনহীন—তার কোন বংশ পরিচয় থাকবে না, সে-কোন উত্তরাধিকারী রেখে যাবে না। কি করবে ঠিক সে জানে না, কিন্তু সে মুক্ত হবে—প্রতিটি নির্জন রাত্রে সে এই কথা ভেবেছে।

লীলা তাকে রমণী শরীর চিনিয়ে দিল। প্রথম প্রথম বড় স্নেহের

সুরে কথা বলতেন পাশের বাড়ির লীলাদি। ইস্কুল মাস্টারি করে ফিরে ক্লান্ত হয়ে বলতেন, অরুণ, ভাই, আমাকে একটু লাইব্রেরী থেকে বইটা বদলে দেবে! বলতেন অরুণ, একদিন ব্যাণ্ডেল যাব, তুমি যাবে আমার সঙ্গে। সন্ধ্যেবেলা নিজের ঘরে বসে ভুরুতে কাজল দিয়ে ঘনঘন আয়না দেখতেন লীলাদি। বলতেন, আমার বড় একা একা লাগে অরুণ। অরুণ, তোমার জন্যও আমার বড্ড মায়া হয়।

'একদিন লীলাদি তার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, দেখিতো অরুণ তুমি আমার চেয়ে কতটা লম্বা। অরুণ দুই হাত দিয়ে লীলাদিকে সামনে টেনে এনে ভয়ংকর দাঁত দিয়ে তার ঠোঁট গাল এবং নাকের খানিকটা ছিঁড়ে নিয়েছিল। ওঃ, 'এত রাগ কেন তোমার, লীলাদি হেসে বলেছিলেন। জামা কাপড় খুলে ফেলবার পর অমন গম্ভীর স্কুল মিস্ট্রেসের হাস্যকর বেঢপ চেহারা দেখে অরুণের ভারী আনন্দ হয়েছিল,—সে ভেবেছিল গলা টিপে ধরে সে জন্মের মত এই লোভী ডাকিনীটার একাকীত্বের দুঃখ ঘুচিয়ে দেয়। লীলাদির শরীরের গন্ধ নিতে নিতে সে ভেবেছিল এখানে নয়, এখানে নয়। তার ভিতর থেকে কে যেন তাকে বলেছিল, এখানে নয়।

এখন অরুণ লীলাদির বাড়ির দিকের জানালা সব সময় বন্ধ করে রাখে।

তারপর অরুণ পরমেশের বোনকে—যে তার সঙ্গে মাঝে মাঝে চায়ের দোকানে গিয়ে অনেক উঁচু তর্ক করত এবং একদিন সিনেমা দেখতে চেয়েছিল—তাকে বলেছিল, আমি তোমাকে মোটেই ভালবাসি না। তবে কেন এ সব কথা বল। পরমেশের বোন মীনাক্ষী ভ্রূভঙ্গী করে বলেছিল, কি ছেলেমানুষ আপনি, এখানে আবার ভালবাসার কথা হলো কোথা থেকে। দু-একটা কথা বললেই ভালবাসা?

—তবে ভালবাসাহীন তোমার শরীরও আমি চাই না। তা ছাড়া আর কি আছে! মনে হয় তুমি আমার মুখ চোখ দিয়ে তোমার প্রশংসা শুনতে চাও। তা শুনে তোমার কি লাভ বল না!

এ কথা শুনে মীনাক্ষীর মুখ এমন কালো হয়ে গিয়েছিল যে মনে হচ্ছিলো, তার সারা মুখে সে বেঞ্জিন মাখিয়ে দিয়েছে।

পরশুদিন রাতে বাবা তাকে ডেকেছিলেন। বহুদিন পর। খাকি খামটা তার দিকে বাড়িয়ে বলেছিলেন, এইটা পড়ে কি করবে ভেবে দেখো।

চিঠিটা সেকেণ্ড রিমাইণ্ডার। অর্থাৎ এর আগে হুবার চিঠি এসেছিল। বাবার মুখে চারদিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চক্ষু কোটরে। অর্থাৎ কি করবেন তা ঠিক করার মত অবস্থা নেই এই প্রৌঢ় কেরাণীর। মহৎ হবার মত সঙ্গতি নেই, স্বার্থপর নিষ্ঠুর হবার মত মনের জোর নেই।

চিঠি পড়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল অরুণ। আমি যে মুক্তি চেয়েছিলাম। তার বয়েস চব্বিশ। সে ঠিক সামনে এসে উপস্থিত হয়েছিল, সে চলে যাবে, সব সম্পর্ক অস্বীকার করবে, নিজের নামটা পর্যন্ত বদলে ফেলবে। এই তার মুক্তির সময়।

এক ঝলক হাওয়া এসে চিঠিটা উড়িয়ে ফেললো মাটিতে। নিচু হয়ে সেটা তুলে ডাঃ কনকেন্দ্র সেন বললেন, ওসব রোমান্টিসিজম আমি শুনতে চাই না। একজন মানুষকেও তার পূর্ণ জ্ঞান ফিরিয়ে দিতে পারলে আমার সবচেয়ে আনন্দ হয়, মনে হয় আমি ঈশ্বরের চেয়েও বড়। আর সে জন্য আপনি হুঃখ করছেন। ছি! কনকেন্দ্র সেনের চোয়াল হুটি শক্ত হয়ে গেছে। বিষম উত্তেজিত তার চোখ।

তবে কি আমি খুদে চাকরি নিয়ে এঁদের ঘর ভাড়া করে মায়ে-ছেলেতে সংসার করবো! রাত্রি বেলা স্বামীর জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনবো, সকালবেলা বাজার করতে গিয়ে লোকের পা মাড়িয়ে দিয়ে ঝগড়া করবো সারাজীবন! মাকে পাগলা গারদ থেকে মুক্তি দিয়ে আমাকে কোন পাগলা গারদে পাঠাতে চাইছেন আপনি!

—তবে কি চান? দায়িত্ব-জ্ঞান-হীন হয়ে এলোমেলো জীবন

কাটাতে দেবো। একা হয়ে কি করবেন আপনি? আপনার ইচ্ছে কিংবা অ্যামবিশান কি?

—জানি না।

জানেন না? শুধু এইটুকুই জেনেছেন যে, কোন দায়িত্ব নিতে পারবেন না। চলুন আমার সঙ্গে গিয়ে মাকে দেখে আসবেন।

—না, আমি যেতে চাই না।

আপনাকে আমি জোর করে নিয়ে যাব! চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভয়ঙ্কর শিকারীর মত এগিয়ে এলেন কনকেন্দ্র সেন। ওঁর খালি হাত দেখেও মনে হয়—হাতে রাইফেল আছে। জোসেফ! গাড়ি বার করতে বল।

চারপাশে উন্মাদের দল, তার মধ্যে দিয়ে ওরা দুজন হেঁটে যাচ্ছে। আমার সঙ্গ ছাড়বেন না। ডাঃ সেন বললেন, তা হলে আর কোন দিন বেরুতে পারবেন না! একবার এই ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলে আর উপায় নেই—তারপর আপনি যতই বলবেন আমি পাগল নই, সেটাই হবে আপনার পাগলামির সবচেয়ে বড় প্রমাণ। যদি এক সঙ্গে মিশে যাই—এই ভেবে ভয়ে অরুণ ডাঃ সেনের হাত চেপে ধরলো।

—আচ্ছা, ঐ লোকটিও কি পাগল? অরুণ জিজ্ঞেস করল। ঘাসের উপর একজন শান্ত চেহারার যুবক বসে আছে, কি ঠাণ্ডা তার চোখের দৃষ্টি। যেন সে মানুষকে ছাড়িয়ে আড়ালের অন্যকিছুও দেখতে পায়।

ও একটি বদ্ধ পাগল।

—কি করে? ভীরুলেণ্ট?

—না ও চুপচাপ বসে থাকে, হাজার চেষ্টা করেও ওকে দিয়ে কথা বলানো যায় না। অরুণের মনে হল, দূরে যে দেবদারু গাছটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে তাকেও নিশ্চয়ই ডাক্তারেরা পাগল বলবে।

একটা ঘরে কোন আসবাব নেই। দেয়ালগুলো ধবধবে সাদা। শুধু মাঝখানে একটা গোল টেবিল। বেয়ারা তিনখানা চেয়ার রেখে

গেল সেখানে। অরুণ চুপ করে বসলো। একটু পরে কনকেন্দ্র সেনের সঙ্গে এক মহিলা নিঃশব্দে ঢুকে একটি চেয়ারে বসলেন। চওড়া চওড়া লাল পাড়ের শাড়ি পরে আছেন।

এই মাতৃমূর্তি! ধক্ করে অরুণের বুকে এসে কি লাগলো। তার মা তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। ছবিতে সে যে-রকম দেখেছিল—তার চেয়ে একেবারে অন্য। যেন তপঃক্লিষ্ট চেহারা। চোখ দুটিতে যেন ঘন নীল অন্ধকার। এই তার মা, এর শরীরের নাড়ি কেটে তার জন্ম হয়েছে। অরুণ তাকাতে পারল না, চোখ ফিরিয়ে নিল। ডাঃ সেন বিশ্বাস করাবার ভঙ্গিতে বললেন আপনার ছেলে অরুণ।

অরুণ! ফিসফিস করার মত বললেন তার মা।

হঠাৎ অরুণের দুপাশের শিরা দপ করে উঠল। সমস্ত মাথাটা যেন ভারী হয়ে এল। অতীতের কোন সন্ন্যাসীর মত সে তার শরীরে যেন মায়াপাশের যন্ত্রণা অনুভব করল। এই অসহায় মহিলাকে ছেড়ে সে কোথায় পালাবে। এই মাতৃমূর্তি! অরুণ যেন কোন জন্ম-বোবার কথা বলার চেষ্টায় দুঃখের মত দুঃখ বোধ করল। জ্বরে যখন তার কপাল পুড়ে গেছে—তখন এই মায়ের হাতের বাতাস পায় নি সে!

হঠাৎ সেই অবস্থাতেও তার মনে হল, যদি সে এখন হঠাৎ শুনতে পায় কোথাও একটা মারাত্মক ভুল হয়েছে, এই মহিলা তার মা নন্ —তার মা অনেকদিন আগে মারা গেছে! তাহলে। তাহলে সে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হবে। এই মহিলার জন্য তার এই মুহূর্তে যে দুঃখ এবং মমতা হচ্ছে—তা অন্তর্হিত হবে। মনে হবে, পৃথিবীতে এমন অনেক দুঃখী মহিলা আছে—সে কি করবে। অর্থাৎ এই মহিলা তার মা হলেও, ঠিক এর জন্যেই সে দুঃখক্লিষ্ট নয়। আসল আকর্ষণ মাতৃ সংস্কারের কবিতায় যা সে পড়েছে। এই সত্যটুকু আবিষ্কার করে অরুণের একটু হেসে উঠতে ইচ্ছে করল। তার মা এক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে উঠলেন।

ডাঃ কনকেন্দ্র সেন অরুণকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে কিছু পরামর্শ করলেন। অরুণ নত মস্তকে শুনলো; তার আর উপায় নেই। মাকে ফেলে সে কোথায় পালাবে, সে পালাবে, সে পারবে না, তার মুক্তি হবে না। না হোক, তার দুঃখ নেই। সে আর কোথাও যাবে না মাকে ফেলে। ডাঃ সেন বললেন, আপনি একটা হোটেল ভাড়া নিন—দিন তিনেক মাকে নিয়ে সেখানে থাকুন, প্রত্যেক দিন আমার সঙ্গে দেখা করবেন। তারপর নর্মাল বোধ করলে কলকাতায় যাবেন। মনে রাখবেন স্বাভাবিক হয়ে বেঁচে থাকবার মত এত আনন্দ আর কিছুতে নেই। অরুণ রাজী হয়ে ডাক্তারকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করল।

সেদিন সন্ধেবেলা আকাশে মেঘ জমেছিল। পাহাড়ী শহরের ঈষৎ শীতের সন্ধ্যা অরুণকে হঠাৎ ক্লান্ত ক'রে দিল। দুপুরবেলা থেকে অরুণের শিরা দুটো যে দপ্ দপ্ করছিল তা এখনও থামে নি। আর তার কোন দ্বিধা নেই, মাকে নিয়ে সাধারণ ভাবেই সে বাঁচতে চায়: তোমাকে আমি অনেক চওড়া পাড়ের কাপড় কিনে দেব। কি চাও তুমি, তোমায় আমি সব দিতে পারি, আমি তোমার দিগবিজয়ী ছেলে অরুণ কিন্তু গোপনে তার ভয় হচ্ছে, সে পারবে না, হেরে যাবে। দুপুরবেলা ঘরে ভাত আনিয়ে খেল দু'জনে। হৈমবতী বিশেষ কোন কথা বলছেন না, গম্ভীর। মাঝে মাঝে শান্ত গাভীর মত চোখ তুলে দেখছেন অরুণকে।

অরুণও কি বললে বুঝতে পারছে না। তার মাকে মনে হচ্ছে অপরিচিত মহিলা। মা তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ তো? সে একবার বললো।

—হ্যাঁ, ঘাড় নেড়ে বোঝালেন হৈমবতী। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, আমাদের আর কেউ ছিল না? বাড়ি ঘর নেই। এখানে আমি কেন?

—ট্রেনের টিকিট পেলাম না। কাল-পরশুই চলে যাব।

দুপুরবেলা এক ঘুম দেবার পর বিকেলে অরুণের ভীষণ মাথা ব্যথা করতে লাগলো। দু চোখ লাল হয়ে এসেছে! কানের দু পাশ দপ্‌দপ্‌ করছে। এইটুকু ঘুমের মধ্যে কত দুঃস্বপ্ন দেখতে হল।

বেড়াতে গেলে হয়তো ভাল লাগবে। মা, তুমি বেড়াতে যাবে?

না, আমি তো হাঁটতে পারি না একেবারেই। আমি বসেই থাকি এখানে।

অরুণ ঘুরতে লাগলো রাস্তায় রাস্তায়। পাহাড়ের পাদমূলে গিয়ে সে ভিক্ষার ভঙ্গিতে বসে পড়ল। যেন ঈশ্বরকে বলতে চাইল দুর্লভ মাতৃমূর্তি ফিরে পেলে যে তীব্র আনন্দ হওয়া উচিত, আমাকে সেই তীব্র আনন্দের উপলব্ধি দাও, হে ঈশ্বর!

সন্ধের পর ধুলোর ঝড় উঠতেই সে ছুটতে ছুটতে হোটেলে ফিরে এল। মা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এখন তাকে অনেকটা স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। বললেন, সত্যিই তো তুই, অরুণ! আমি কি সত্যই ভাল হয়ে গেছি। তোর বাবা কেমন আছে রে?

তারপর আস্তে আস্তে জড়তা কেটে গেল। দুজনে খাটের ওপর বসে অনেক কথা বলল। অরুণও গলগল করে অনবরত কথা বলতে লাগলো এত কথা বহুদিন বলে নি। তার বুকের মধ্যে একটা বিরাট জলপ্রপাত যেন ঝাপটা দিচ্ছে। হৈমবতী কত বললেন তার বিয়ের সময়ের কথা, অরুণের জন্মের কথা, পাগলা গারদের অসংখ্য চরিত্রের কথা। ডাঃ সেন কেমন ভাল লোক, বিমান মজুমদার কেমন বদমায়েস —যুবতী মেয়েদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। তোর বাবার ঐ স্বভাব ছিল। জানিস্ পথে ঘাটে বেরুলেই অন্য মেয়ের দিকে হাঁ করে তাকাতো। একদম লক্ষ্মীছাড়া পুরুষ।

হাঁ জানো মা, বাবা আবার বিয়ে করেছে সেই নতুন বউয়ের কি সাজগোজ। হোহো করে দুজনে হেসে উঠলো। ডাক্তার অরুণকে একথা এখনই বলতে বারণ করেছিলেন। অরুণের মনে নেই।

—কলকাতায় গিয়ে আমরা ওখানে যাবো। দুজনে খিদিরপুরে
হবো বুঝলে! আমার তো আবার জাহাজের কারবার। জাহাজে
ড় এদেশ ওদেশ প্রায়ই যেতে হবে। একদিন মীনাক্ষীকে সঙ্গে
য়ে যাবো। মেয়েটা বড় হ্যাংলা।

—আমার পেটে মাঝে মাঝে বড় ব্যথা করে। কলকাতায় গিয়ে
মায় একটু ওষুধ কিনে দিবি তো? আর একটু জর্দা—অনেকদিন
! দিয়ে পান খাই না!

ওসব হল চাকরের কাজ। একদিন হারাধন আসে নি, আমাকে
ন কিনা মসলা বেটে দিতে! শিল নোড়া নিয়ে দাঁত ভাঙবো
বেছিলুম,—অরুণ হঠাৎ লাথি মেরে হোটেলের নড়বড়ে আলনাটা
টতে ফেলে দিল।

—বিমানের বউটা পাগলি, বুঝলি অরুণ, কাঁথা সেলাই করে।
পাগলি, ও পাগলি, হা-হা-হা, জানতুম তো পাগলি, লীলাদিও
লল—ওকে জাহাজে নেব না!

—তুর তুর সে হল অন্যরকম। আমার কানের পাশে একটা
টা দাগ দেখেছিস এরকম আর কারুর নেই।

—আমি দ্বীপে গিয়ে থাকবো, এইরকম মানুষের কপালের মত
।। বন্দুক থাকবে, দ্বীপে, ভেবেছিলুম সমুদ্রে ভেবেছিলুম, দ্বীপে···।

—তখন মারতে পারিস নি, যখন আমাকে এখানে পাঠালো।

অরুণ উঠে গিয়ে দড়াম করে দরজায় একটা লাথি মারলো!

মার, মার, আরও মার যেন উঠতে না পারে। দুজনেই আবার
সঙ্গে হোহো করে হেসে উঠলো। তোমার হাত দেখি মা, অরুণ
ল, তুমি একশো বছর বাঁচবে, একশো দুশো বছর। আমি তোমায়
চয়ে রাখবো, কোথাও যাবো না। ভেবেছিলুম খনির মধ্যে, খনির
ধ্যে···তোর বাবা এখনও নাক ডাকে নাকি রে···আফ্রিকায় যাবো

ভীষণ নাক ডাকতো···লীলাদি হ্যাংলা দুচোখের বিষ ছিলাম বি
আমি···কি শরীরের লোভ···তাই আমাকে···হ্যাংলা সরিয়ে দিল।

—তোর নাম কে অরুণ রেখেছে রে ?

—খবর্দার ! নাম তুলে কথা বলবেন না। কে অরুণ ? অ
আমি আগে ছিলাম। জুতিয়ে মুখ লম্বা করে দেবো ডাক্তারের।

—ওরে মুখপড়ি তুই আবার জুতো পরতে শিখলি কবে
বাবা মারা যাবার সময় রক্ত বমি হয়েছিল। আমারও রক্ত বমি হবে

তোমার জন্য আমার বড় কষ্ট হত। মা, তোমাকে ছেড়ে কোথা
যাবে না।

ভেবেছিলাম, তুই ভাববার কে রে···চোপরাও···বেতের ঝ
বানাতে বানাতে হাতে যে···ভেবেছিলাম মঙ্গলের দ্বীপে···কড়া প
গেল···ভেবেছিলাম মঙ্গলের দ্বীপে··কড়া পড়ে গেল···ভেবেছিলা
একা একা···ডালে ফ্যান মিশিয়ে দেয়···ভেবেছিলাম আদিম মানুষে
মত···কতদিন কলমী শাক খাইনি···ভেবেছিলুম জঙ্গলে জঙ্গলে জঙ্গ
···রক্তবমি··· ··

অরুণ উঠে দাঁড়িয়ে নিজের জামাটা খুলতে গিয়ে একটানে ছিঁ
ফেললো, হুংকার দিয়ে বলল, গেট আউট। দরজায় লাথি
দু তিনজন লোক ছুটে এল—ওর মধ্যে একজন, যার সঙ্গে
অরুণের সামান্য আলাপ হয়েছিল, বেশ উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞেস করল,
হল কি, অরুণবাবু ? অরুণের চোখ লাল, বলল, গেট আউট, বুকে
ভেতরটা কে দেখতে বলেছিল, গেট আউট ! কে দেখতে বলেছি
বুকের মধ্যে।

ওর মা হি-হি করে হাসতে হাঁপাতে লাগলো।

পরদিন সকালে খবর পেয়ে ডাঃ কনকেন্দ্র সেন চারজন লো
সঙ্গে নিয়ে এসে ওদের হাসপাতালে নিয়ে গেলেন।